Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আক্তার

রোলঃ 227020217

২৩ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আক্তার

রোলঃ 227020217

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয়" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া আক্তার, আইডিঃ 227020217 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ অমুসলিমদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয়” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৩ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সাদিয়া আক্তার

আইডিঃ 227020217

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

খ্রিস্টান মিশনারি:...6

একটি পরিসংখ্যান:..22

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদী তৎপরতার গোড়ার কথা:..24

বাংলাদেশে মিশনারির আগমন:- 26

খ্রিস্টান বানানোর অপকৌশলসমূহ:..29

মি.বুশের একটি ভাষণ: 35

জুমল্যান্ড পরিকল্পনা:..35

যে সমস্ত এনজিও সেবার নামে সরাসরি ধর্ম প্রচার করছে: 36

পাহাড়িদের বিভিন্ন উপজাতি: 37

এনজিওদের কার্যক্রম:...37

মিশনারির স্বরূপ সন্ধানে: 38

মিশনারি শ্রেণীবিভাগ: 39

বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক:...39

প্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যম:...39

প্রকাশনা: 41

প্রকাশনায় অপকৌশল:..42

খ্রিষ্টধর্ম প্রচারিভাযান:..45

প্রচার ও প্রচারণার অপকৌশল:..46

সাঁওতাল ভাইদের কি খবর ? 47

ইন্টারনেটে নাস্তিক্যবাদী প্রচারনার আধিপত্য: 50

২০২৫ সাল পর্যন্ত খৃষ্টানদের বিভিন্ন টার্গেট ও পরিকল্পনা:-.................................52

আমরা এই নাস্তিকদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করব?..55

নাস্তিকদের প্রতিরোধের উপায়:- 57

নাস্তিক্যবাদী অপতৎপরতা মোকাবেলায় করণীয়:- 69

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী 92

খ্রিস্টান মিশনারি:

খ্রিস্টান মিশনারি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত সংগঠন। প্রধানত প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রিস্টান মিশনারি উপনিবেশিক আমলে বাংলায় সক্রিয় থাকলেও তাঁদের সংযোগ স্থাপন শুরু হয় ষোলো শতকে। কথিত আছে যে, সেইন্ট টমাস ছিলেন প্রথম খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক যিনি ৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন এবং ৫৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মালাবার উপকূলে একদল লোককে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন। তখন থেকে সিরীয়, রোমান ক্যাথলিক ও বিশেষত জেসুইট সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারকগণ নানা সময় ভারত সফর করেন। কিন্তু খ্রিস্ট ধর্ম দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে।

জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রচারকদের মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক দলের সাথে বাংলার সংযোগ স্থাপিত হয়; ১৫৭৬ সালে ফাদার অ্যান্টোনী ভাজ ও ফাদার পিটার ডায়াস এবং ১৫৮০ সালে রোমান ক্যাথলিক যাজকদের আগমন ঘটে। ওলন্দাজদের দ্বারা স্থাপিত শহর ব্যান্ডেল তাঁদের কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রারম্ভে জেসুইট ও রোমান ক্যাথলিকবৃন্দ একত্রে কাজ করেছেন এবং ১৫৯৯ সালে একটি গির্জা ও একটি মঠ স্থাপন করেন। ধর্ম শিক্ষার জন্য একটি কনভেন্ট স্কুল ও সেইন্ট পলের জেসুইট কলেজও প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৬২২ সালে সেইন্ট পল কলেজের রেক্টর হিসেবে ফাদার পিটার গোমেজের নিয়োগের মধ্য দিয়ে ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষা কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়। বি. রড্রিকস্, জেমস গোমেজ, সাইমন দি ফিগুরেডো ও আন্দ্রে ম্যাশাডো এটিকে শিক্ষাদান ও খ্রিস্টান ধর্মের সুসমাচার পৌঁছানোর একটি মহতী কেন্দ্রে পরিণত করেন। এক দশকের মধ্যে দশ হাজারের মতো ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করা হয় বলে দাবি করা হয়।

১৬৩৩ সালে শাহজাহানের এক ফরমান এর মাধ্যমে গির্জার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধাসহ ৭৭৭ বিঘা নিষ্কর জমি দান করা হয়। উনিশ শতকব্যাপী ব্যান্ডেল গির্জা শিক্ষাসংক্রান্ত ধর্মপ্রচার চালিয়ে যেতে থাকে, যদিও কোম্পানির সরকার ১৭৯৭ সালে ফরমানটি বাতিল করে। ১৯২৮ সালে ব্যান্ডেল গির্জাকে ডন বস্কোর সেইন্ট

ফ্রান্সিস দি স্যালেসের অনুগামী রোমান ক্যাথলিক দলের নিকট ন্যস্ত করা হয়। উপনিবেশিক আমল ও তারও পরবর্তী সময়ে এটা বাংলার বিভিন্ন অংশে ডন বস্কো ফুলের বিভিন্ন শাখা, অক্সিলিয়াম কনভেন্ট ও সেইন্ট পল'স স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু বাংলায় ব্রিটিশ (প্রোটেস্ট্যান্ট) ক্ষমতার আর্বিভাবের সাথে সাথে রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রচার কাজ অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মপ্রচারকগণ প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকেন।

আঠারো শতকের শেষ দশকে ব্রিটিশ প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মপ্রচারকদের আগমনের সাথে সাথে বাংলায় খ্রিস্টান ধর্মপ্রচার কাজ একটি সংগঠিত আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। সমসাময়িক ইংল্যান্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের পুনরুজ্জীবনের ফলে সকল দেশে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের জন্য বেশ কয়েকটি ধর্মপ্রচারক সমিতি গঠিত হয়। এগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো ১৭৯২, ১৭৯৫ ও ১৭৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত যথাক্রমে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি, লন্ডন মিশনারি সোসাইটি ও চার্চ মিশনারি সোসাইটি। প্রথম দুটি ছিল নন্-কনফ্রিমস্ট সংগঠন ও তৃতীয়টি ছিল অ্যাংলিকান (ইংল্যান্ডের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত গির্জার প্রতিনিধিত্বকারী)। এর কয়েক দশক পর ১৮৩০ সালে আলেকজান্ডার ডাফ (১৮০৮-১৮৭৮)-এর অধীনে স্কটল্যান্ডের গির্জা বাংলায় ধর্মপ্রচার কাজ শুরু করে। কিন্তু এ সকল গির্জা বাংলায় ধর্মপ্রচার কাজ চালানোর ক্ষেত্রে প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ১৮৩১ সালে আন্তঃসম্প্রদায়গত ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্স গঠন এ ধরনের সম্প্রদায়গত মননের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বাংলায় খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণ ইংল্যান্ডের প্রথম দিকের প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মানবতাবাদী ধ্যান-ধারণা অনুসরণ করেছিলেন এবং ধর্মপ্রচার কার্যক্রমে 'সামাজিক দিকসমূহের' প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্কটিশ ধর্মপ্রচারকগণ ও আইরিশদের গির্জার যাজকীয় শাসনতন্ত্রের সমর্থকবৃন্দও এ কার্যক্রম অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা উনিশ শতককে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারের বিশিষ্টতম শতকে রূপান্তরিত করে। এ

শতক ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণেরও এক গুরুত্বপূর্ণ কাল বলে বিবেচিত। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে পশ্চিমা বাণিজ্য ও সংস্কৃতি প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করে। এ বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ বিদেশে ধর্মপ্রচার কাজের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। জার্মানি, নেদারল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক ইত্যাদি রাষ্ট্রসমূহ ধর্মপ্রচার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করে।

শুধু ব্রিটিশ প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মপ্রচারকগণই অত্যুৎসাহী হয়ে ধর্মপ্রচারে প্রবল আগ্রহ প্রদর্শন করেন। ব্রিটিশ ক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলা তাঁদের কার্যাবলির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। যাহোক, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম দিকে তাঁদের সংগঠিত কাজের বিরোধিতা করে। ১৮০০ সালে যাজক উইলিয়ম কেরীর বাংলায় আগমনের পর তাঁর অধীনে বাংলায় প্রথম সংগঠিত ধর্মপ্রচার কাজ শুরু হয়। ওই বছর শ্রীরামপুরে (সে সময়ে ডেনমার্কের নিয়ন্ত্রণে) কেরী প্রথম ব্যাপ্টিস্ট মিশন আরম্ভ করেন। তাঁর দুজন সহযোগী ছিলেন জোশুয়া মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭) ও উইলিয়ম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩) এবং তাঁরা বিখ্যাত শ্রীরামপুর ত্রয়ীর সদস্য ছিলেন। লন্ডন মিশনারি সোসাইটিও ওলন্দাজদের শহর চুঁচুড়ায় ১৭৯৮ সালে ন্যাথানিয়েল ফোরসিথের অধীনে ধর্মপ্রচার কাজ শুরু করেন। কোম্পানির ১৮১৩ সালের সনদের মাধ্যমে ভারতে ধর্মপ্রচারকদের উদ্যোগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর চার্চ মিশনারি সোসাইটি ভারতে প্রবেশ করে; এদের প্রথম ধর্মপ্রচারকদ্বয় গ্রীনউড ও স্ট্রোয়েটার ১৮১৬ সালে কলকাতায় এসে পৌঁছান।

খ্রিস্টান ধর্ম ও উপমহাদেশের ধর্মসমূহের মধ্যকার সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণ ইসলামের অনুসারীদের প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হন। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হিসেবে মুসলমানগণ খ্রিস্টান ধর্মের 'ত্রিত্ববাদী' মতবাদকে গ্রহণ করতে পারেনি। শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি প্রেস থেকে ১৮০৯ সালে প্রচারিত একটি প্রচার পত্রে নবী মুহম্মদ (স.) সম্পর্কে কতিপয় প্রতিকূল মন্তব্য করা হলে তা মুসলমানদের মধ্যে

ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। শ্রীরামপুর ত্রয়ী এ প্রকাশনাটিকে একটি অবিবেচনাপ্রসূত কাজ বলে রায় দেয় এবং এরপর আর কখনও এরকম কিছু প্রকাশ করেনি যা মুসলমানদের মনে আঘাত হানতে পারে। এখন থেকে মুসলমানদের মাঝে ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে যাজকগণ অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন। সাধারণভাবে মুসলমান সমাজ খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টার আওতার বাইরে থেকে যায় এবং মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামীণ পূর্ব বঙ্গে অতি অল্প কয়েকটি ধর্মপ্রচার কেন্দ্র গড়ে ওঠেছিল।

বাংলায় প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মপ্রচারকদের কর্মকান্ডকে মোটামুটি তিনটি সময়কালে ভাগ করা যায়: ১৭৯৩-১৮৩৪ এবং ১৮৩৪-১৮৫৭, এ দুটি যুগ
যথাক্রমে কেরী ও ডাফের যুগ বলে পরিচিত, এবং সবশেষে ১৮৫৭ সাল থেকে শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত।

প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ কেরীর আমলে- প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত করার ব্যাপারে প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে দেশিয় ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতিসাধন এবং শিক্ষা বিস্তারের ওপর। শ্রীরামপুর ত্রয়ী কিছু হিন্দু সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আচারানুষ্ঠান, যেমন জাতিভেদ প্রথা, সতীদাহ, শিশুহত্যা, অন্তর্জলি (রুগ্ন ব্যক্তিদের নদীর তীরে অনাবৃত অবস্থায় ফেলে রাখা), ইত্যাদি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। ১৮০৪ থেকে ১৮২৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এ রকম কিছু আচারকে নিষিদ্ধ করতে আইন পাসে তাঁরা সহায়ক ছিলেন।

তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, শুধু খ্রিস্টানদের সত্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষাই এ সামাজিক ব্যাধিসমূহ দূর করতে পারে। প্রাথমিকভাবে মাতৃভাষার প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও শ্রীরামপুর ত্রয়ী গ্রাম্য পাঠশালার ওপর ভিত্তি করে বিরাজমান শিক্ষা ব্যবস্থায় খ্রিস্টান ধারণাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। সাধারণ

জনগণের নিকট শিক্ষা পৌঁছে দিতে 'সর্দার-পড়া'র মতো দেশিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কেরী জনগণের শিক্ষার একটি কার্যক্রম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৮৩০-এর দশকে ইংরেজদের দ্বারা প্রচলিত রীতি হিসেবে চালু করা শিক্ষার ব্যাপারে 'নিম্ন দিকে চোয়ানো তত্ত্বে' (downward filtration theory) উইলিয়ম কেরীর কোনো আস্থা ছিল না এবং তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিম্ন দিক থেকে গড়ে উপরের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর সহযোগী জে. মার্শম্যান ১৮১৬ সালে গ্রামাঞ্চলে মাতৃভাষা শিক্ষাদানকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য 'স্থানীয় স্কুল সম্বন্ধে আভাস' নামে পরিচিত একটি সম্পূর্ণ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেন। এতে জোর দেওয়া হয় যে, শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত জনগণের মাতৃভাষা। গ্রামের স্কুলসমূহের উচিত পাটিগণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোলের মোটামুটি প্রধান অংশসমূহ, প্রাকৃতিক দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে 'উন্নত' পাঠক্রম অনুসরণ করা। এ কর্মপরিকল্পনা আপাতভাবে সাফল্যমন্ডিত হয়; ১৮১৮ সাল নাগাদ ৬,৭০৩ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ১০৩টি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ব্যাপ্টিস্টদের 'নন্-কনফর্মিস্ট নীতি-বোধ' প্রারম্ভে তাঁদেরকে কোনোপ্রকার রাষ্ট্রীয় সাহায্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে। আরেকটি ভিন্নমত পোষণকারী অঙ্গ-সংগঠন, লন্ডন মিশনারি সোসাইটি, ১৮১৪ সালে চুঁচুড়ায় রবার্ট মে'র অধীনে এর সমশ্রেণীর গ্রাম্য প্রাথমিক স্কুলসমূহের প্রথমটি স্থাপন করে। ১৮১৮ সালে এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ২,৬৯৫ জন ছাত্র- ছাত্রী নিয়ে ৩৬টি প্রাথমিক স্কুল।

একজন সত্যিকার 'খ্রিস্টান প্রাচ্যবিদ' হিসেবে কেরী তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় সনাতন ও মাতৃভাষা সংক্রান্ত ধারণাসমূহকে সংযুক্ত করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এর (১৮০০) অধ্যাপক এবং এশিয়াটিক সোসাইটির (১৮০৬) সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসেবে তিনি প্রাচ্যদেশীয় সনাতন বিদ্যাসমূহের অধ্যয়নকে উৎসাহিত করেছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারত ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের পথ সহজ

করে তোলার জন্য বাইবেলকে সংস্কৃতি ও ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা উচিত। যদিও মুখ্যত তিনি মাতৃভাষায় জ্ঞান চর্চার একজন সমর্থক, তবু কেরী উচ্চ শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করেননি। ১৮১৩ সালে চার্টার অ্যাক্ট পাসের পর ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তিনি সরকারি অনুদানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার প্রণীত ভারতের দেশিয় অধিবাসীদের ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পরিকল্পনাকে (জুন, ১৮১৪) ভারতে প্রথম সর্বাত্মক শিক্ষাদানের প্রোগ্রাম হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর ত্রয়ী এশীয় যুবাদের প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্য ও ইউরোপীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ শিক্ষা দান করতে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তাঁরা খ্রিস্টানধর্ম শিক্ষা প্রদানে ধর্মপ্রচারক ও শিক্ষক হিসেবে ইউরোপীয়দের স্থান দখল করে নিতে পারে।

শ্রীরামপুর মিশন মুদ্রণ ও প্রকাশনা ক্ষেত্রেও পথিকৃৎ ছিল। কেরী ছিলেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ। তাঁর নির্দেশনায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস পূর্ণাঙ্গ বাইবেলের বাংলা, অহমীয়, উড়িয়া, হিন্দি, মারাঠি ও সংস্কৃত অনুবাদ ছাপায়।

বাইবেলের অনুবাদ ছাড়াও ব্যান্টিস্টগণ ও তাঁদের ভারতীয় সহযোগীবৃন্দ (যেমন, রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার) রামায়ণ ও অন্যান্য ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের অংশ বিশেষ অনুবাদ করেন। তাঁরা বহুসংখ্যক গবেষণামূলক প্রবন্ধ অথবা প্রচারণমূলক পুস্তিকা (১৮২৯ সাল নাগাদ প্রায় ৩৩,০৫০টি) অনুবাদ, মুদ্রণ ও বিতরণ করেন। এ দৃষ্টান্ত কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটিকে (১৮১৭) ১৮২১ সাল নাগাদ বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করে। এ প্রকাশনাসমূহ সন্দেহাতীতভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্যের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

শ্রীরামপুর থেকে অন্যান্য বাংলা প্রকাশনাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কেরীর কথোপকথন যা বাংলার সমকালীন সামাজিক জীবনকে প্রতিফলিত করে। ব্রিটিশ ব্যাপ্টিস্ট শিক্ষাবিদ জন ম্যাকের প্রিন্সিপল্‌স অব কেমিস্ট্রি (১৮২৪ সালে প্রকাশিত)

রাসায়নিক শব্দাবলি ও চিন্তাধারা বাংলায় উপস্থাপিত করে। উইলিয়ম ওয়াড্রের একাউন্ট অব দি রাইটিংস, রিলিজিয়ন অ্যান্ড ম্যানার্স অব দি হিন্দুস (১৮১১ সালে প্রকাশিত) হিন্দুদের বিশ্বাসসমূহ ও সমাজ সম্পর্কে ব্যাপ্টিস্টদের কৌতূহলের ইঙ্গিত দেয়।

শ্রীরামপুরের ধর্মপ্রচারকগণ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও পথিকৃৎ ছিলেন। জে. সি. মার্শম্যানের দিগদর্শন, ম্যাগাজিন ফর ইন্ডিয়ান ইয়ুথ (ইংরেজি ও বাংলায়), সমাচার দর্পণ (১৮১৮ সালে প্রকাশিত) ও দি ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া (ঐ একই সালে প্রকাশিত) কতিপয় সমকালীন সামাজিক সমস্যার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উনিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে মিশনারি সোসাইটিসমূহ ব্যাপক বিন্যস্ত তথ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সম্প্রদায়গত সাময়িকীসমূহ প্রকাশ করা শুরু করে। দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান ইন্টেলিজেন্সার (চার্চ মিশনারি সোসাইটি সমিতি, ১৮৪০-১৮৬৫), দি ক্রিশ্চিয়ান স্পেক্টেটর, অরিয়েন্টাল ব্যাপ্টিস্ট ও মিশনারি হেরাল্ড (ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি, ১৮৫৬-১৯১০) ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। প্রথম আন্তঃসম্প্রদায়গত সাময়িকী দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজারভার ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্স-এর মতপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয়। এটিকে অনুসরণ করে ইভ্যানজেলিক্যাল রিভিউ প্রকাশিত হয়। এটি ১৮৭৩ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। এ সমায়িকীসমূহের অধিকাংশই বঙ্গীয় সমাজের কিছু সমকালীন সমস্যাকে প্রতিফলিত করে এবং এগুলি প্রতিকারের জন্য পরামর্শ দেয়।

বিশিষ্ট স্কটিশ ধর্মপ্রচারক আলেকজান্ডার ডাফ (১৮০৬-১৮৭৮) এর কলকাতা আগমনের (মে, ১৮৩০) সাথে সাথে ধর্ম প্রচারের কাজে 'অ্যাংলিক্যানিজম' (ইংল্যান্ডে সরকার অনুমোদিত গির্জার রীতিনীতি) 'অরিয়েন্টালিজম'কে কোণঠাসা করে ফেলে। ইংরেজ জাতির সত্যিকারের উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ১৮৩০ সালের ১৩ জুলাই তারিখে স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বাঙালি যুবকদের পাশ্চাত্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি করেন। ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানকারী এ

স্কুলটি (পরবর্তীকালে এটিকে কলেজে রূপান্তরিত করা হয়) যথার্থই খ্রিস্টান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহন করছিল। ডাফের বিশ্বাসমতে কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছেলেরা সাধারণ জনতার নিকট খ্রিস্টান জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে। ডাফের কলেজটি 'উচ্চ বর্ণের' হিন্দু যুবকদের ধর্মান্তরিত করার কাজে প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়।

ডাফ তিনটি পর্যায়ে ১৮৩০-৩৪, ১৮৪০-৪৯ ও ১৮৫৬-৬৩ কলকাতায় অবস্থান করেন। তাঁর শিক্ষাদান কার্যক্রম প্ররোচনায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে ১৮৩২ থেকে ১৮৪৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কলকাতার একদল যুবক (মহেশ চন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণ মোহন ব্যানার্জী ও লাল বিহারী দে তাঁদের মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ) খ্রিস্টান হন। এ ধর্মান্তরকরণ কলকাতার সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ডাফের প্রচেষ্টাকে রামমোহন রায় উষ্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন, কিন্তু ধর্মান্তরকরণের পদ্ধতি ব্রাহ্ম সমাজকে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। উনিশ শতকব্যাপী এ প্রশ্নে দুদলের মধ্যে বিতর্ক চলতে থাকে। ইংরেজি শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মপ্রচারকদের সাফল্য ছিল সীমিত। উড-এর শিক্ষা প্রস্তাব (১৮৫৪) বেসরকারি স্কুলসমূহের জন্য সরকারি অনুদান প্রবর্তন করার পর (১৮৫৫) বাংলা ভাষায় পরিচালিত স্কুলসমূহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকলে ধর্মপ্রচারকগণ সেগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। এ স্কুলগুলি মিশনারি স্কুলসমূহকে ইংরেজি শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে প্রায় হটিয়ে দেয়। শেষোক্ত স্কুলগুলি সরকারি সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে প্রায়শ যোগ্য না হওয়ার কারণে এ ক্ষেত্র থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। গির্জা ধর্মপ্রচারক সমিতি কর্তৃক পরিচালিত ক্যাথেড্রাল মিশন কলেজও (১৮৬৫ সালে স্থাপিত) প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৮৫৫ সালে স্থাপিত) এবং মেট্রোপলিটান ও সিটি কলেজসমূহের (উভয়টিকেই ১৮৭৯ সালে ডিগ্রি কলেজ হিসেবে অধিভুক্তি দেওয়া হয়) সাথে প্রতিযোগিতা চালাতে ব্যর্থ হয়। ১৮৮০ সালে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এখন থেকে ধর্মপ্রচারকগণ সাধারণ জনগণের শিক্ষাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে অধিক মনোনিবেশ করেন এবং ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্সের মাধ্যমে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করেন। এ কনফারেন্সের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব রেভারেন্ড জেমস লং উচ্চতর শিক্ষাকে কিছুটা অবহেলা করেও গণশিক্ষাকে সম্মুখপানে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ কর্মপরিকল্পনাসমূহে মাঝে-মধ্যে বাংলার সাধারণ জনতার কল্যাণের জন্য ধর্মপ্রচারকদের আন্তরিক উদ্বেগ প্রকাশ পেত, যা প্রায়শ সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করত। সাধারণ জনতার গণশিক্ষার প্রসারের জন্য হান্টার কমিশন এর (১৮৮৫) সুপারিশমালাকে ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্স তাদের প্রচেষ্টার পরম বিজয় বলে গণ্য করে।

ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্স বাংলার কৃষকদের পক্ষও সমর্থন করেছিল। বাংলার গ্রামের বাস্তব অবস্থার সাথে তাদের সংযোগ তাঁদেরকে উপনিবেশিক ভূমি রাজস্ব নীতি ও বিচার ব্যবস্থার অনিয়ম সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। বাংলার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কারের অনুকূলে কনফারেন্স ইংল্যান্ড ও ভারতে জনমত গড়ে তুলতে চেয়েছিল। বাংলায় কর্মরত প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মপ্রচারকদের প্রথম সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠানের (কলকাতা, ৪-৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫) মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রচেষ্টা শুরু হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং ভারত ও বাংলা সরকারের নিকট বেশ কয়েকটি আবেদনপত্রে (১৮৫২-১৮৫৯) ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্স এ ব্যবস্থাটির প্রতিকারের জন্য অন্যান্য পরামর্শের পাশাপাশি বাংলায় ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে ওকালতি করেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, একটি 'উদারবাদী খ্রিস্টীয়' ইউরোপীয় সম্প্রদায় ভূমি ব্যবস্থার অপব্যবহার দূর করতে সমর্থ হবে। কিন্তু ১৮৫৯-৬০ সালের নীল চাষ প্রতিরোধ আন্দোলন চলাকালে এরূপ সম্প্রদায়ের 'আশীর্বাদ' সম্পর্কে তাদের পুরোপুরি মোহমুক্তি ঘটে। নীল সঙ্কটের পর বাংলায় কর্মরত ধর্মপ্রচারকগণ বিশ্বাস করেন যে, কেবল 'বিচক্ষণ খ্রিস্টান শিক্ষা' কৃষকদের দুর্দশা থেকে রক্ষা করতে পারে। সাধারণ গণশিক্ষার ওপর তারা ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ক্রিশ্চিয়ান ভার্নাকুলার এডুকেশন

সোসাইটির (১৮৫৮ সালে লন্ডন প্রতিষ্ঠিত) বেঙ্গল কমিটির উদ্যোগে গৃহীত সাধারণ গণশিক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস হওয়া পর্যন্ত, যেটি ধর্মপ্রাচারকদের বিশ্বাসমতে ভূমি ব্যবস্থার অনেকগুলি অনিয়মকে দূর করেছে, ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্স কৃষকদের সমর্থক ছিল। এরপর থেকে বাংলায় কর্মরত ধর্মপ্রচারকগণ 'রাজনৈতিক কর্মসূচি' পরিত্যাগ করেন।

খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণই ছিলেন প্রথম উদ্যোক্তা যারা ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্সে নারী ধর্মপ্রচারকদের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে লিঙ্গ ভেদাভেদকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। ১৮৭৭ সালে পুরুষের সমমর্যাদা ও অধিকার সহকারে নারী ধর্মপ্রচারকদের পূর্ণ সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এরূপ আন্তঃসম্প্রদায়গত ধর্মপ্রচারকদের কনফারেন্স ১৮৪৫ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বোম্বে, মাদ্রাজ ও ব্যাঙ্গালোরে গঠন করা হয়, যেখানে নারীদের কনফারেন্সে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তাদেরকে বক্তব্য রাখতে অথবা ভোট দিতে অনুমতি দেওয়া হয়নি। ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্সে নারী ধর্মপ্রচারকদের অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদার কিছু কিছু লিঙ্গগত বিচার্য বিষয়াবলি সম্মুখে নিয়ে আসে।

১৭৯৬ সালের দিকেই বাংলায় কেরী এ বিচার্য বিষয়াবলিতে নারী ধর্মপ্রচারকদের সম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভারতীয় নারীদের পদমর্যাদা-হানিকর অবস্থা বিবেচনা করে ১৮২০ সালে উইলিয়ম ওয়ার্ড ইংরেজ নারীদের নিকট ধর্মপ্রচার কাজে যোগদানের আবেদন জানান। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রথম নারী ধর্মপ্রচারক মিস মেরী অ্যান কুক ১৮২২ সালে কলকাতা পৌঁছান। তবে মেয়েদের জন্য প্রথম মিশন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন রবার্ট মে (লন্ডন মিশনারি সোসাইটির) ১৮১৮ সালে চুঁচুড়ায়। ১৮২৩ সাল নাগাদ ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি সোসাইটির

সাহায্য নিয়ে মিস কুক (পরবর্তীকালে মিসেস উইলসন) কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় ৩০০ ছাত্রী নিয়ে ১৫টি স্কুল স্থাপন করেন। এ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্কুলগুলির তদারকি করা কঠিন কাজ অনুভব করে তিনি স্থানীয় স্কুলগুলিকে একত্রিত করে ১৮২৮ সালে কলকাতায় 'কেন্দ্রীয় স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। নবগঠিত ইউরোপীয় মহিলাদের প্রতিষ্ঠান লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন (১৮২৪ সালে), যার সভানেত্রী ছিলেন গভর্নর জেনারেলের স্ত্রী লেটা আমহার্স্ট, তাঁকে এর ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে। ব্যাপ্টিস্টরা কলকাতায় (১৮২৯ সালে) এবং ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি সোসাইটি বর্ধমানে (১৮৩২ সালে) এ ধরনের কেন্দ্রীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। ১৮২৩ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যবর্তী দশকে ধর্মপ্রচারকগণ বাংলায় তাঁদের বিভিন্ন ধর্মপ্রচার আবাসস্থলে (যেমন কাটোয়া, সুরি, বহরমপুর, চুঁচুড়া, বর্ধমান, কালনা, বাঁকুড়া, কৃষ্ণনগর, বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ইত্যাদি) এ রকম আরও কয়েকটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপ্রচারকদের স্ত্রীগণ সাধারণত তাঁদের নিজ নিজ ধর্মপ্রচার আবাসস্থলে এ স্কুলগুলির দায়িত্বভারও গ্রহণ করেন। এখানকার পাঠ্যক্রম ছেলেদের স্কুলের পাঠ্যক্রমের অনুরূপ ছিল। মেয়েদের দিকে স্কুলসমূহের সাফল্য নগন্য হওয়ায় ধর্মপ্রচারকগণ বোর্ডিং স্কুলের ওপর অধিক মনোযোগ দেওয়া শুরু করেন। প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ স্কুলসমূহে অধিক ছাত্রী নিয়ে আসে। এ নিঃস্ব মেয়েদেরকে আশ্রয় ও খাদ্য প্রদান করা হত। সময় যত অতিবাহিত হতে থাকে এ স্কুলগুলি তত বেশি খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিতকরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে থাকে।

১৮৫৫ সালের পর বাঙালিদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয়গুলি মিশন স্কুলসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয়। ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (হান্টার কমিশন) রিপোর্ট প্রদান করে যে, সমগ্র ভারতব্যাপী মেয়েদের ৭,০০০ মিশনারি স্কুলে যে ছাত্রীরা পড়াশোনা করে তাদের অধিকাংশই খ্রিস্টান। বোর্ডিং স্কুলগুলি শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান নারীদের শিক্ষার 'নার্সারি'তে পরিণত হয়।

একই সাথে ধর্মপ্রচারকগণ 'জেনানা ব্যবস্থায়' (এ ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মপ্রচারকদের স্ত্রীগণ অপরের গৃহে গিয়ে শিক্ষা প্রদান করতেন) মনোনিবেশ করেন। উনিশ শতকে প্রথম দিকে প্রবর্তিত এ ব্যবস্থাটির কথা ১৮৫৪ সালের শিক্ষা প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাফল্যের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশন এ ব্যবস্থাটি চালু রাখতে বিশেষ অনুদানের সুপারিশ করে। কয়েকটি নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্ম ও হিন্দু পরিবার (যেমন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেন এর পরিবার) এ ব্যবস্থাটিকে উৎসাহিত করেছিলেন। কারণ তাঁরা চাইতেন যে, তাঁদের পরিবারের নারী সদস্যরাও শিক্ষিত হোক। ১৮৭১ সালে অন্য প্রেসিডেন্সিসমূহ একত্রিত করলে যা হয়, বাংলায় তার চেয়েও অধিক জেনানা' শিক্ষার্থী ছিল।১৮৬৬ ও ১৮৭২ সালে একেশ্বরবাদী নারী শিক্ষাবিদ যথাক্রমে মেরী কার্পেন্টার ও অ্যানেট সুসানা অ্যাক্রয়েড বেভারীজ এর কলকাতা এসে পৌঁছার সাথে সাথে ব্রাহ্ম/হিন্দু সংস্কারকগণ ও একেশ্বরবাদী খ্রিস্টানদের মধ্যে নারী শিক্ষা সম্পর্কে সহযোগিতার একটি পর্যায় শুরু হয়। তাঁদের উভয়েই ব্রাহ্ম নরমাল স্কুল ও হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণ নারী শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশই নিয়ন্ত্রণ করতেন। ১৯৩২ সালে ভারতের সাতটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের মধ্যে পাঁচটি ছিল খ্রিস্টানদের প্রতিষ্ঠান এবং ১৫৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১০০ জনেরও অধিক ছিলেন খ্রিস্টান। উপনিবেশিক বাংলায় নারীদের আনুষ্ঠানিক ও পেশাগত শিক্ষা ক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণ অবশ্যই পথিকৃৎ ছিলেন।

উনিশ শতকের বাংলায় খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণ উপজাতিদের প্রশ্নে একটি সমস্যামূলক বিষয়ে জড়িত হয়ে পড়েন। পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ উপজাতি সাঁওতালদের ওপর তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বাংলার বহুত্ববাদী সমাজে উপজাতিদের ঐতিহ্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিবেচনা করে তাঁরা সাঁওতালদের দুর্বোধ্য জগতে প্রবেশ করেন এবং তাদের জীবন ও চিন্তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে চেষ্টা করেন। কতিপয় উপনিবেশিক আমলাকে বাদ দিলে ধর্মপ্রচারকগণই 'উপজাতীয় গবেষণায়' পথিকৃৎ ছিলেন। তাঁরা এতে অমূল্য

অবদান রাখেন। পি.ও বোডিংয়ের গবেষণাকর্ম এ সানতাল ডিক্সনারী (৫ খন্ডে, ১৯৩২-১৯৩৬ সালে প্রকাশিত) এবং এল.ও ক্রেফ্যাডের সাঁওতালি ও ইংরেজিতে প্রচুর পরিমাণ প্রমোদ-ভ্রমণ সংক্রান্ত বর্ণনা এখন পর্যন্ত এ ধরনের গবেষণায় বিশিষ্টতম স্থান দখল করে আছে।

ধর্মপ্রচারকগণ সাঁওতালদেরকে তাদের নিজেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রদান করার পক্ষপাতী এবং খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দেওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আগ্রহী ছিলেন। নর্দান চার্চের (প্রাক্তন ইন্ডিয়ান হোম মিশন) সাঁওতাল মিশন পরবর্তী সময়ে উপজাতিদের ধর্মান্তরিতকরণের সর্ববৃহৎ মিশনে পরিণত হয় এবং ভারতে ও বিদেশে অনেকটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চার্চ মিশন সোসাইটি এবং ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটি ছিল এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সক্রিয় দুটি ধর্মপ্রচার সমিতি। চার্চ মিশন সোসাইটি ১৮৫৪ সালে এবং ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটি ১৮৬৭ সালে কাজ শুরু করে। এর পূর্বে ১৮২৪ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত এবং ১৮২৬ সালে টি. এ. লেসলি ক্রিশ্চিয়ানকে সাঁওতালদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতে পাঠানো হয়, কিন্তু এক বছরের মধ্যে ক্রিশ্চিয়ানের মৃত্যু ঘটে এবং 'জঙ্গল জ্বরে' আক্রান্ত হয়ে লেসলিও তাঁর কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। চার্চ মিশন সোসাইটির জার্মান ধর্মপ্রচারক ই. ডিরোয়েসে ১৮৫৪ সালে ধর্মপ্রচার কাজ শুরু করেন। এর অল্প কিছুকাল পর সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫ সালে সংঘটিত) চার্চ মিশনারি সোসাইটির সাঁওতাল মিশনে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করে। 'শিক্ষার চরম অভাব' ও 'সাঁওতাল ধর্মীয় বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা' বিদ্রোহের জন্য দায়ী এ বিশ্বাস থেকে বাংলা সরকার সাঁওতালদের শিক্ষিত করে তুলতে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নে চার্চ মিশনারি সোসাইটিকে অনুরোধ করে এবং এ উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে রাজি হয়। কলকাতাস্থ কমিটি কর্তৃক যে কর্মপরিকল্পনা দাখিল করা হয় তাতে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাসহ বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভারত সরকার ১৮৫৬ সালে এ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে, কিন্তু ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লব শুরু হলে এর বাস্তবায়ন

ব্যাহত হয়। এ প্রারম্ভিক বাধায় হতোদ্যম না হয়ে চার্চ মিশনারি সোসাইটি ১৮৫৯ সালে ভাগলপুর মিশনের সাঁওতাল শাখা খোলে। ই. এল পাক্সলির অধীনে একটি স্বতন্ত্র একক হিসেবে সাঁওতাল মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৫৬ সালে বাংলার কিছু এলাকাসহ নতুন সৃষ্ট সাঁওতাল পরগনার কিছু কিছু অংশে মিশনের কয়েকটি নতুন আবাসস্থল প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাঁওতাল মাঝিদের (প্রধান ব্যক্তি) সহযোগিতা নিয়ে পাক্সলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'সাঁওতালীকরণের' প্রয়োজনীয়তার প্রতি জোর দিয়েছিলেন। ১৮৬৩ সালে তিনি সাঁওতাল ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রোমান হরফে সাঁওতাল ভাষাকে একটি লিখিত আকৃতি প্রদান করেন। ১৮৬৬ সাল নাগাদ তিনি সাঁওতাল শব্দকোষ, সাঁওতাল অভিধান, বাইবেলের ইতিহাস, সেইন্ট ম্যাথিউর উপদেশাবলির অংশবিশেষ ও ইংল্যান্ডের সরকার অনুমোদিত গির্জায় ব্যবহৃত প্রার্থনা পুস্তক রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। পাক্সলির কার্যকলাপ ছিল সত্যিই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ১৮৬২ সালে ১০টি 'অকেজো' স্কুল নিয়ে শুরু করে ১৮৬৮ সালে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি ৩৪৮ জন ছাত্র-ছাত্রীসহ ৩৬টি স্কুল রেখে যান। প্রশিক্ষণ স্কুলটি বিরাট সাফল্য বলে প্রমাণিত হয় এবং এটি ছিল 'খ্রিস্টান ধর্মের দিকে চালিত করার' একটি কেন্দ্র।

পাক্সলির সাফল্য ১৮৬৮ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে একদল চার্চ মিশনারিকে (যেমন, জে. ব্রাউন, ই. টি কোল, এ. স্টার্ক, এইচ. ডেভিস ও এইচ. ডাবি-উ শ্যাকেল) সাঁওতাল মিশনের প্রতি আকৃষ্ট করে। কলকাতা বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক সাঁওতাল ভাষায় অধিকসংখ্যক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টা সাঁওতালদের মাঝে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে যেহেতু ধর্মপ্রচারকগণ তাদের মনে এ বিশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হয় যে, জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিক্ষাই হলো একমাত্র রক্ষাকবচ। ১৮৭১ থেকে ১৮৮১ সালব্যাপী খেরওয়ার আন্দোলনের (খেরওয়ার শব্দটি এসেছে 'খায়ের' শব্দ থেকে যার অর্থ 'মানুষ'। এটি ছিল সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক পুনর্জাগরণের জন্য আন্দোলন) উদ্ভব

ও অগ্রগতিও শিক্ষার প্রতি প্রবল উৎসাহের পেছনে ভূমিকা ছিল। একদল সাঁওতাল, যারা ইংরেজি শিক্ষার জন্য আগ্রহী ছিল, তারা এ জন্য খরচ চালাতে রাজি ছিল। সাঁওতাল পরগনাসমূহে ১৮৮০ সালে ৪০ জন সাঁওতাল ছাত্র-ছাত্রীকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করা হয়। সাঁওতাল মিশনে জর্জ ক্যাম্বেলের (১৮৭১ থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট গভর্নরের) গভীর আগ্রহ এবং সাঁওতালদের শিক্ষার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুদান ধর্মপ্রচারকদের অনুপ্রাণিত করে। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ সাঁওতালদের শিক্ষিত করে তোলার কাজ একচেটিয়াভাবে ধর্মপ্রচারক সমিতিগুলির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রধান উদ্দেশ্য, যা ছিল খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার মাধ্যমে বাংলার মানবগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করা, কখনও পূরণ হয়নি। বাস্তবিকপক্ষে, ধর্মপ্রচারকগণ নিজেরাই বাংলার মূল সমাজ থেকে বাইরে অবস্থান করছিলেন। 'তাঁরা নিজেরা যেভাবে পরবাসী সম্প্রদায় হিসেবে মূলধারা থেকে বাইরে ছিলেন' তদ্রুপ তাঁদের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করত 'জাতিচ্যুত ও উপজাতিদের ধর্মান্তরকরণের মাঝে। চার্চ ও ব্যাপ্টিস্ট মিশনসমূহের সর্বাধিক সংখ্যক ধর্মান্তরিতগণ আসত কর্তাভজাদের (ঈশ্বরের পূজারী) মধ্য থেকে, যারা ছিল 'নিম্নতম' পদমর্যাদার হিন্দু, যেমন চন্ডাল ও নমঃশূদ্রদের মাঝে গড়ে ওঠতে থাকা একটি হিন্দু, সমতাবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায়। কৃষ্ণনগর জেলায় চার্চ মিশনারি সোসাইটির আবাসস্থল) জলঙ্গি নদীর এক ব্যনার পর ১৮৩৮-৩৯ সালে প্রায় ৩,০০০ 'কর্তাভজা' স্বেচ্ছায় খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। ধর্মপ্রচারকদের নিকট থেকে বন্যার আক্রান্তদের ত্রাণকার্য সম্ভবত এ 'বিরাট পরিবর্তন'কে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৮৪০-এর দশকে বরিশাল ও যশোহর (ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির আবাসস্থল) থেকে বৃহৎ সংখ্যক 'কর্তাভজা'ও খ্রিস্টান হয়। উনিশ শতকে বাংলায় এটা ছিল খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি সাধারণ জনতার পবির্তনের প্রথম ও সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা।

বিশ শতকে খ্রিস্টান গির্জাসমূহ কিছু নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করে যেগুলি ধর্মপ্রচারকাজে 'বিপ-ব' বলে পরিগণিত হয়। সামাজিক কল্যাণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিক্ষাগত ও চিকিৎসা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার ও শিক্ষাদানের পুরাতন পদ্ধতিসমূহকে প্রতিস্থাপিত করে। অ-খ্রিস্টান ধর্ম ও সংস্কৃতিসমূহের প্রতি অধিক যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের সাথে সাথে তাঁরা এ নতুন ব্যবস্থাসমূহকে এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূরণের ভিন্ন উপায় হিসেবে চিন্তা করতে শুরু করেন। 'ধ্বংস সাধন নয়, বরং প্রতিপালন করা' এ ঐশ্বরিক নির্দেশ তাঁদের অনেকের নীতিবাক্যে পরিণত হয়। ইউরোপ-কেন্দ্রিক অভিমত পরিত্যাগ করে তাঁরা আন্তর্জাতিক, আজগোত্রীয় ও আত্মসম্প্রদায়গত গির্জা গঠনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যান।

যখন থেকে উইলিয়ম কেরী ১৮১০ সালে ধর্মপ্রচারকদের বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন তখন থেকে বাংলার ধর্মপ্রচারকদের একটি শাখা এ রকম একটি সংগঠন গড়ে তোলার কথা চিন্তা করছিলেন। ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্স ছিল এ লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ। এ ধরনের চিন্তাধারা বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের প্রস্তুতিতে প্রণোদিত করে, যা ১৯১০ সালে এডিনবরায় ধর্মপ্রচারকদের বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠানের সাথে সাথে শুরু হয়।'

একটি পরিসংখ্যান:

দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন মূল দাবী হলেও তাদের কোন কোন এনজিও এসব কর্মকাণ্ডের আড়ালে খৃষ্টান মিশনারির "ধর্মান্তর কর্মসূচি" প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা সমাজের অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে ধর্মান্তরের প্রধান টার্গেট বানায়। খৃষ্টান মিশনারি ও তাদের সহযোগী এনজিওগুলো কাজের ও কর্মসূচীর দিক দিয়ে ভিন্ন হলেও তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন। উভয়ের প্রধান লক্ষ্য বিশ্বে খৃষ্টান জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটানো। এ লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের দেশে এনজিও ও মিশনারিগুলো কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তারা অনেকটা সফল। বাংলাদেশের খৃষ্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করলে সে কথার প্রমাণ মিলে।

১৮৮১ সালে প্রতি ৬ হাজার লোকের মাঝে ১ জন খৃষ্টান ছিল। সে সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে প্রতি ৩২৬ জনের মাঝে ১ জন, ১৯৮১ সালে প্রতি ২৯ জনের মাঝে ১ জন, ১৯৯১ সালে প্রতি বাইশজনের মাঝে একজন খৃষ্টান রয়েছে বলে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ১৯৩৯ সালে খৃষ্টান জনসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালে আদমশুমারিতে খৃষ্টান জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখে। ২০০১ সালের আদমশুমারিতে খৃষ্টান জনসংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঢাকায় খৃষ্টানদের সবচেয়ে বড় গির্জা "হলি রোজারি"। ১৮৭৭ সালে পর্তুগিজ ব্যবসায়ীগণ এটি নির্মাণ করেন। ১৯৫২ সালে উক্ত গির্জায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ১৫৩ জন আর ১৯৭৬ সালে তা ৩০০০ জনে উন্নীত হয়, ১৯৮৩ সালে উপস্থিতি ৬০০০ জনে আর ১৯৯৮ সালে উপস্থিতির সংখ্যা ৫০,০০০ এ পৌঁছে।

বাংলাদেশে এনজিও ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিও সংখ্যা ৮৫০। এর বাইরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন নিয়ে কাজ করছে এমন এনজিওর সংখ্যা বিশ থেকে ত্রিশ হাজার অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতি ১.১৮ বর্গমাইলের মাঝে একটি এনজিও কাজ করছে।

বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের বিস্তার সম্পর্কিত ব্যাপারগুলোর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ পর্যন্ত এনজিও আওতাধীন গ্রামের সংখ্যা ৪০ হাজার, পরিবারের সংখ্যা

৩৫ লাখ। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এনজিওদের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকা। উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০ হাজার। ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা ১০ লাখ, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ৪৪ লাখ, এনজিওদের রোপণকৃত বৃক্ষের সংখ্যা ৪ কোটি। উপরোক্ত তথ্য ও সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। কিন্তু ২০১০ সালে মদিনা ইউনিভার্সিটি একটি পরিসংখানে দেখায়, বাংলাদেশে বর্তমান খৃষ্টানদের সংখ্যা ১০ মিলিয়ন অর্থাৎ ১ কোটি। আর বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটির ঊর্ধ্বে। মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। আর খৃষ্টানদের সংখ্যা প্রায় ১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগে, তারা কি একজন ১৩ জন করে সন্তান জন্ম দিয়েছে ? আবার, জন্মনিয়ন্ত্রণ থিওরি তাদেরই মতবাদ। যদি বলা হয়, না; তাহলে এই বাকি জনসংখ্যা এলো কোত্থেকে ? অবশ্যই এরা ধর্মান্তরিত খৃষ্টান।

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদী তৎপরতার গোড়ার কথা:

আসুন প্রথমেই নাস্তিক্যবাদ সম্পর্কে অল্প কিছু জেনে নেয়া যাক।

নাস্তিক্যবাদ (ইংরেজি ভাষায় : Atheism; অন্যান্য নাম : নিরীশ্বরবাদ, নাস্তিকতাবাদ) একটি দর্শনের নাম যাতে ঈশ্বর বা স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না এবং সম্পূর্ণ ভৌত ও প্রাকৃতিক উপায়ে প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেয়া হয়। আস্তিক্যবাদ বর্জনকেই নাস্তিক্যবাদ বলা যায়। নাস্তিক্যবাদ বিশ্বাস নয় বরং অবিশ্বাস এবং যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাস খণ্ডন নয় বরং বিশ্বাসের অনুপস্থিতিই এখানে মুখ্য। [বাংলা ইউকিপিডিয়া]

ইংরেজি 'এইথিজম' (Atheism) শব্দের অর্থ হল নাস্তিক্য বা নিরীশ্বরবাদ। এইথিজম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক 'এথোস' শব্দটি থেকে। শব্দটি সেই সকল মানুষকে নির্দেশ করে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই বলে মনে করে এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর প্রতি অন্ধবিশ্বাসকে যুক্তি দ্বারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করে। দিনদিনমুক্ত চিন্তা, সংশয়বাদী চিন্তাধারা এবং ধর্মসমূহের সমালোচনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিক্যবাদেরও প্রসার ঘটছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম কিছু মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে স্বীকৃতি দেয়। বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যার ২.৩% মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয় এবং ১১.৯% মানুষ কোন ধর্মেই বিশ্বাস করে না। জপানের৬৪% থকে ৬৫% নাস্তিক অথবা ধর্মে অবিশ্বাসী। রাশিয়াতে এই সংখ্যা প্রায় ৪৮% এবংইউরোপিয় ইউনিয়নে৬% (ইতালি) থেকে শুরু করে ৮৫% (সুইডেন) পর্যন্ত।

পশ্চিমের দেশগুলোতে নাস্তিকদের সাধারণভাবে ধর্মহীন বা পারলৌকিক বিষয়সমূহে অবিশ্বাসী হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তুবৌদ্ধ ধর্মেরমত যেসব ধর্মে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় না, সেসব ধর্মালম্বীদেরকেও নাস্তিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিছু নাস্তিক ব্যক্তিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা, হিন্দু ধর্মের দর্শন,যুক্তিবাদ, মানবতাবাদএবংপ্রকৃতিবাদেবিশ্বাস করে।

নাস্তিকরা কোনো বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী নয় এবং তারা বিশেষ কোনো আচার অনুষ্ঠানও পালন করে না। অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে যে কেউ, যে কোনো মতাদর্শের সমর্থক

হতে পারে, নাস্তিকদের মিল শুধুমাত্র এক জায়গায়ই, তা হলো, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করা।

◯ ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশে নাস্তিকের সংখ্যা বরাবরই কম ছিল। এরা সংখ্যায় কম হলেও এদের প্রচার ও বুদ্ধিবৃত্তির বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিপরীতে অবস্থান নেবার দুঃসাহস দেখাতে পারছে। মূলত গেল শতাব্দীর শুরুভাগে রাশিয়ার কমিউনিজমে বিশ্বাসীরা এ দেশে নাস্তিকতার প্রসার ঘটিয়েছে। সারাবিশ্বে সমাজতন্ত্রের জয়জয়কারের সঙ্গে হাত ধরে সেক্যুলারিজম আর সেক্যুলারিজমের গর্ভ থেকেই নাস্তিক্যবাদ বা এইথিজমের উদ্ভব ও আগমন। সমাজতন্ত্রের যৌবনে এরা প্রধানত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাদের মতবাদ প্রচার করতে শুরু করে।

সমস্যা জর্জরিত সদ্য স্বাধীন অভাবী বাংলাদেশে এরা সহজেই তাদের সাম্যের মুখরোচক শ্লোগানে তরুণ সমাজকে মুগ্ধ করে। সমাজতন্ত্রের পতনের পর এরা পরিবর্তিত বাস্তবতায় নিজেদের ভোল পাল্টাতে থাকলেও সাবেকি ধর্মবিদ্বেষ তথা ইসলামবিদ্বেষের ধারা ঠিকই বজায় রাখে। ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যর্থ হওয়ায় এরা সেটাকে ধর্মের বিরোধিতায় কাজে লাগায়। সিংহভাগ ঈমানদার নারী-পুরুষের আত্মোৎসর্গের বদৌলতে পাওয়া অত্যাচারী ও অবিবেচক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয়কে এরা ইসলামের বিরুদ্ধে বিজয় হিসেবে চালাবার অপকৌশল গ্রহণ করে।

বাংলাদেশে মিশনারির আগমন:-

মিশনারি হলো খৃষ্টানদের দাওয়াতি সংস্থা। সারা দুনিয়াতে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে লক্ষ্ লক্ষ প্রচারকের মাধ্যমে খৃষ্টানরা খৃষ্টধর্মের দাওয়াত দিয়ে আসছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, আজ থেকে পাঁচশ বা ছয়শ বছর আগে খৃষ্টান মিশনারিরা এই বাংলায় আসে। পর্তুগিজরা যখন বাংলায় বা ভারতে আসে তখন সাথে করে খৃষ্টান মিশনারিদেরও নিয়ে আসে। জেসুইস ও অগস্টেইনিয়া নামক ক্যাথলিক খৃষ্টানদের দুটো দল পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের ছত্রছায়ায় ২০০ বছর যাবত বাংলায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করে আসছে। মোগল সম্রাট আকবর ভারতের বাঙাল প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান হুগলিতে পর্তুগিজদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দিলে তাদের ছত্রছায়ায় মিশনারিরা এসে এলাকায় গির্জা প্রতিষ্ঠা করলো,স্কুল বানালো, হাসপাতাল চালু করলো। হুগলিকে কেন্দ্র করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে তারা ঢাকাতেও নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করলো।

এভাবে ১৬২১ খৃষ্টাব্দে এতদাঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারি তৎপরতা পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান ৭৭৭ বিঘা জমি বিনা খাজনায় (লা-খেরাজ) খৃষ্টান মিশনারিদের দান করলেন। ফলে তারা আরো বেশী উৎসাহিত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোঘল আমলে খৃষ্টান মিশনারিরা অগস্টেইনিয়া গির্জা গড়ে তোলে। (আমাদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন দল-উপদল আছে, তেমন খৃষ্টানদের মধ্যে বিভিন্ন দল আছে, যেমন – জেসুইল, অগস্টেইনিয়া, ক্যাথলিক, ব্যাপটিস্ট, প্রটেস্ট্যান্ট ইত্যাদি) মোগল আমলে মোগল বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বাংলায় ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে ১৩ টি অগস্টেইনিয়া গির্জা গড়ে উঠে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা বেশী। ব্যাপটিস্টদের সংখ্যাও কম নয়।

১৯০৮ সালে ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় ব্যাপটিস্টরা এসে একটি সোসাইটি হাসপাতাল গড়ে তোলে। লেবৃসি হসপিটাল কুষ্ঠনিরাময় কেন্দ্র খোলে। বাংলাদেশে মোট খৃষ্টান সংখ্যা ৫ লাখ, এর মধ্যে ব্যাপটিস্ট খৃষ্টানদের সংখ্যা বর্তমানে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ছলে বলে কৌশলে পুরো ভারতের ক্ষমতা হাতে নিলো, তখন মূলত আনুষ্ঠানিকভাবে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা চালু হয়। পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখি, খৃষ্টানরা যেখানেই গেছে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে আর সমাজের বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করেছে। হাসপাতাল স্থাপন, ঋণসুবিধা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং দরিদ্রতা বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নারীদের ক্ষমতায়ন তাদের অন্যতম শ্লোগান আজ। তবে খৃষ্টধর্ম প্রচারই তাদের মূল লক্ষ্য। যা সেবার ছলনায় শুরু থেকেই তারা বাস্তবায়ন করে আসছে।

১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলনের পর এই উপমহাদেশে ৯০ টি প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান মিশনারি কর্মরত ছিল। তারা এদেশে জটিল রোগের চিকিৎসার জন্যে বড় বড় ডাক্তার, সার্জনদের ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসে এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের মালুমা ঘাট, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতাল তৈরি করে বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দেয়। এর আড়ালে সমতল ভূমি ও পার্বত্য এলাকায় খৃষ্টধর্ম প্রচার পুরোপুরি অব্যাহত রাখে।

৭১ এ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ৩০,০০০ এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। এই এনজিওরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে। প্রশ্ন জাগে, এই টাকা দেয় কারা ? তাদের তো টাকশাল নেই, তারা টাকা বানায় না। বিশ্বের বড় বড় ধনকুবেররা ইয়াহুদি ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। আর কোন ধনকুবের বরং সাধারণ সম্পদশালীও তার অর্থ বেকার খরচ করে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানদের খৃষ্টান বানানোর জন্য তারা কোটি কোটি টাকা খৃষ্টান মিশনারিতে দেয়।

◯Board of Directors এর প্রস্তাব:

আযাদী আন্দোলনের পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানদের Board of Directors গৃহীত প্রস্তাবে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তাতে খোলাখুলি বলা হয়েছে যে, “প্রকৃতি ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি এই জন্যে ব্রিটেনের কাছে সোপর্দ করে, যাতে এতদঅঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মিশনারিদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। তাই এতদঞ্চলকে খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিৎ।” (সূত্রঃ তারিখে পাকিস্তান)

বর্তমানে এটাই বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে।

খ্রিস্টান বানানোর অপকৌশলসমূহ:

মুসলিমদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আলোকিত করেছেন তাদের কাছে এটা অস্পষ্ট নয় যে, ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্য সকল কাফির অপশক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুতার উদ্দেশ্যে জোটবদ্ধ হয়েছে; তাদেরকে ধর্মচ্যুত করতে এবং নিজ ধর্মের প্রতি সন্দিহান করার উদ্দেশ্যে; অথচ আল্লাহ তা'আলা এ সত্য দীন ইসলামকে প্রচারের জন্যই সকল নবী রাসূলদের ধারা পরিসমাপ্তকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন।

জনসাধারণকে ইসলাম থেকে বাধা প্রদান, মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট ও তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ব করা এবং তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অনেক অপকৌশল কাফিরদের নিকট রয়েছে। তাদের ধর্মপ্রচার সংস্থাগুলো উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং বর্তমানে তাদের অপতৎপরতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তাদের অপকৌশল ও পথভ্রষ্টকারী প্রচার মাধ্যমের অন্যতম হলো, “আহলে কিতাব মিশন দক্ষিণ আফ্রিকা” নামক প্রচার পত্র। তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল সংকলিত বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রোগ্রাম সম্বলিত এই প্রচার পত্রটি ইসলামের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে আরব ভূখণ্ডে ব্যক্তিগত বা সংস্থা ও সংগঠনের নামে বিনা মূল্যে ডাকযোগে বা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

অতএব, বিধর্মীদের এসব সুসংগঠিত কর্মকাণ্ডের নিন্দা ও এগুলোর ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদের সমস্ত অপতৎপরতা থেকে সতর্ক করার বিষয়টি মুসলিমদের জন্য আগাম সুসংবাদ হিসেবে বিবেচিত। তাদের এ সব ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সৌদী আরবের ফাতওয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির নিকট বারবার পত্র ও টেলিফোনে দৃষ্টি আকর্ষণ করাও একটি প্রশংসিত উদ্যোগ হিসেবে গণ্য। যারা এসব চিঠি লিখেছেন তারা এমন কিছু দ্বীনী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, যারা চেয়েছেন এর মাধ্যমে উক্ত দ্বীনী গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি কর্তৃক খ্রিস্টানদের এসব প্রকাশনার ভয়াবহতা ও মারাত্মক কুফুরী দাওয়াতের ব্যাপারে মুসলিমদের সতর্ক করার।

পৃথিবীর বুকে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত হওয়ার উষালগ্ন থেকেই ইসলামের শত্রুরা নিজ নিজ জাতি-ধর্ম ভেদাভেদ ভুলে ইসলামের বিরুদ্ধে দিবা-রাত্রি চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তারা ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে, যাতে তাদেরকে হিদায়াতের আলো থেকে বের করে ভ্রষ্টতার গভীর অন্ধকারে নিয়ে যেতে পারে।তারা চায় ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে উপনিবেশে পরিণত করতে এবং ইসলামী শক্তির প্রভাব মানুষের অন্তরে দুর্বল করে দিতে। তাদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَلَا ٱلۡمُشۡرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ خَيۡرٖ مِّن رَّبِّكُمۡۚ﴾ [البقرة: ١٠٥]

"আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান) মধ্যে যারা কুফুরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা এটা চায় না যে, তোমাদের রবের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি কোনো কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১০৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَدَّ كَثِيرٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِكُمۡ كُفَّارًا حَسَدٗا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّۖ﴾ [البقرة: ١٠٩]

"তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী-খ্রিস্টান) অনেকেই তোমাদের ঈমান আনার পর ঈর্ষামূলক মনোভাববশতঃ আবার তোমাদেরকে কাফিররূপে ফিরিয়ে পাওয়ার আকাঙ্খা করে।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১০৯]

তিনি আরো বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ كَٰفِرِينَ ١٠٠﴾ [ال عمران: ١٠٠]

"হে মুমিনগণ! যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফির বানিয়ে ছাড়বে।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০০]

ইসলামের প্রধান শত্রুদের মধ্যে অন্যতম হলো মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিস্টান জাতি। তারা সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রসার প্রতিরোধের জন্য তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে

চলেছে। বরং তারা মুসলিম দেশে গিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের বর্তমান দুর্বল অবস্থাসমূহকে পুঁজি করে অগ্রসর হচ্ছে।

এটা সুস্পষ্ট যে, তাদের এ আকস্মিক আক্রমণের উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমদের আক্বীদা-বিশ্বাসকে দুর্বল করা এবং দীন ইসলামের প্রতি সন্দেহ জাগিয়ে দেওয়া, এসবের মাধ্যমে তারা মুসলিমদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত। তাদের এসব মিশনারী কার্যক্রমকে তারা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে 'তাবশীর' বা সুসংবাদ' নামকরণ করেছে। বস্তুত তাদের এসব কার্যক্রম তো মূর্তিপূজার প্রতিই আহ্বান, যা বিকৃত খ্রিস্টবাদ। যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো প্রমাণ নেই। আর আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

এ সব খ্রিস্টান তাদের এসব দুঃস্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষে অজস্র অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে যাচ্ছে; এসব দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরো বিশ্বকে খ্রিস্টান বানানো, বিশেষ করে মুসলিমদেরকে; কিন্তু তাদের অবস্থা তো ঐরূপ যেমন আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيۡهِمۡ حَسۡرَةٗ ثُمَّ يُغۡلَبُونَۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحۡشَرُونَ ٣٦﴾ [الانفال: ٣٦]

"আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য কাফিরগণ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে। অতঃপর তা তাদের পরিতাপের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফুরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে।" [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৬]

◯ বহুকাল থেকে তারা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অনেক সম্মেলন করেছে। এমন কি বর্তমানেও তাদের মিশনে উক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীগণ দূত হিসেবে তাদের নিকট কৌশলসমূহের কার্যকারিতা, তাদের প্রভাব, তাদের সফলতা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মত-বিনিময় ও প্রস্তাব নিয়ে একত্রিত হয়। আর এজন্য তারা সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

তাদের অপকৌশলসমূহ নিম্নরূপ:

- মুসলিম বিশ্বে খ্রিস্টান মিশনারী গোষ্ঠী প্রেরণ এবং খ্রিস্টবাদের দিকে আহ্বান জানানো: এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা নিম্নোক্ত কর্মসূচীসমূহ গ্রহণ করেছে:

- খ্রিস্টান ধর্মের পরিচিতিমূলক বিভিন্ন বই, বিজ্ঞাপন ও লিফলেট বিতরণ।
- বিকৃত ইঞ্জিলের অনুবাদ প্রচার ও প্রসার।
- ইসলামের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টিকারী ও আক্রমণাত্মক প্রচারপত্র বিলি করা।
- এবং বিশ্বের দরবারে ইসলামের বিকৃতিমূলক নানা দিক তুলে ধরা।
- অতঃপর তারা কতিপয় মোড়ক আবৃত ও বক্র-কুটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে অতিসূক্ষ্ম পন্থায় লোকদেরকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। তাদের এসব মারাত্মক কিছু পদ্ধতি নিম্নরূপ:
- চিকিৎসা সেবা ও জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান: মুসলিম সমাজে ব্যাপকহারে রোগ-ব্যাধি বিস্তার সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় মুসলিম ডাক্তারের স্বল্পতা এমনকি কোনো কোনো স্থানে না থাকার সুবাদে চিকিৎসার চাহিদা তাদের এই পদ্ধতি প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।
- সাধারণ শিক্ষার অন্তরালে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার: কোথাও কোথোও সরাসরি খ্রিস্টান স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার মাধ্যমে তাদের এই অপতৎপরতা চলছে। আবার কোথাও কোথাও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সবার জন্য সাধারণ শিক্ষা নাম দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে, যার অন্তরালে রয়েছে তাদেরকে খ্রিস্টান বানানোর গোপণ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা। আর তাদের পাতানো উক্ত জালে বড় অংকের মুসলিম জনগোষ্ঠী পতিত হয়েছে, বিদেশী ভাষা বা বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের লোভে ছেলে-মেয়েদেরকে তাদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করছে। এর পরিণতিতে দেখা যায় এ মুসলিম জাতি, তাদের তাজা মস্তিষ্কসম্পন্ন, যাদের মগজ বর্তমানে সব ধরনের জ্ঞানার্জনের জন্য উন্মুক্ত, সে সব কলিজার টুকরা শিশু কিশোরদেরকে খ্রিস্টানদের হাতে হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেছে চলেছে!! আর খ্রিস্টানরা যা-ই তাদেরকে প্রদান করছে এ বাচ্চারা তা-ই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করছে!!
- তথ্য ও প্রচার মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচার: খ্রিস্টান মিশনারীদের খ্রিস্টান বানানোর অন্যতম কৌশল হচ্ছে, তথ্য ও প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার। মুসলিম বিশ্বের দিকে

তাক করা রয়েছে তাদের বহু রেডিও চ্যানেল। তাছাড়া পরবর্তী কয়েক বছরে তারা শত শত টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে তুলে ধরছে তাদের বিকৃত ধর্ম ও তার প্রোগ্রামসমূহ।

- এছাড়া সংবাদ পত্র, পত্র-পত্রিকা এবং তাদের অসংখ্য প্রকাশনা, প্রচারণাও এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। তাদের উক্ত দর্শনীয়, শ্রুত ও পঠিতব্য সম্প্রচার মাধ্যমগুলো খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের চাকাকে বিভিন্ন ভাবে সামনে এগিয়ে দিয়েছে, যেমন:

(ক) তারা ঐসব সম্প্রচার মাধ্যমগুলোর দ্বারা খ্রিস্টান ধর্মের তথাকথিত বানানো বৈশিষ্ট্যের প্রচার করছে। তারা বিশ্বের সকলের জন্য খ্রিস্টান ধর্মে দয়া, ভালোবাসা ইত্যাদি রয়েছে বলে মিথ্যা তথ্য প্রচার-প্রসার করে তাদের ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

(খ) মুসলিমদের আকীদা-বিশ্বাস, তাদের ধর্মীয় নিদর্শন এবং তাদের পরস্পরের দীনী সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার মাধ্যমে তাদের বিকৃত খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আহ্বান করছে।

(গ) নগ্নতা, যৌনতা, প্রবৃত্তি উত্তেজক বিবিধ অশ্লীলতা সম্প্রচার করে দর্শকদের নৈতিক চরিত্র ও পবিত্রতা বিনষ্ট করা, লজ্জাহীন বানানো। তাদেরকে প্রবৃত্তি পূজারী ও ক্ষণস্থায়ী আনন্দের মোহে নিপতিত করে ভোগের দাসে পরিণত করা। কেননা তারা এ ধরনের হয়ে গেলে তাদের যে কোনো দাওয়াত বা মিশন তাদের মাঝে সফল হবে। এমনকি মুরতাদ-কাফির হওয়ার ব্যাপারেও তাদের কোনো দ্বিধা থাকবে না। (আল্লাহ আমাদের এ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন) তাদের উক্ত মিশন সফল হওয়ার ভিত্তিতে মুসলিমের অন্তর থেকে যখন ঈমানের মূলোৎপাটন হবে এবং আত্মা থেকে ধর্মীয় চেতনার বাঁধ ধ্বংস হয়ে যাবে তখন সহজেই উক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।

- উল্লিখিত খ্রিস্টান তৈরির অপকৌশল ব্যতীত তাদের আরো বহু অপকৌশল রয়েছে, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তা যথার্থভাবে অনুভব করতে পারবেন। আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্য সেগুলো বাদ রাখা হয়েছে। কেননা এই অল্প পরিসরে তাদের সবগুলো

অপকৌশল বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের থেকে সতর্ক করাই মূল উদ্দেশ্য। বস্তুত তাদের প্রকৃত অবস্থা তো তা-ই যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বিধৃত করেছেন এ বলে যে,

وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٣٠﴾ [الانفال: ٣٠]

“আর তারা ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহও (তাদের ষড়যন্ত্রের বিপরীতে) কৌশল করেন। বস্তুতঃ আল্লাহর কৌশল অতি উত্তম।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَيَأۡبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٣٢﴾ [التوبة: ٣٢]

“তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণতা বিধান করা ব্যতীত অন্য কিছু চান না।”

[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩২]

মি.বুশের একটি ভাষণ:

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ, ইরাক আক্রমণের পূর্বে এক ভাষণ দেন যা ১৪টি ভাষায় প্রচারিত হয়েছিল। তিনি বলছিলেন, ঈশ্বর মার্কিন সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন ভালোকে সম্প্রসারণ এবং মন্দকে প্রতিহত করতে (আমর বিল মা'রুফ নাহি আনিল মুনাকার) অতএব এই সরকার বাইবেলে প্রদত্ত নীতি অনুযায়ী মার্কিন জাতিকে রক্ষা এবং সারা বিশ্ববাসীকে গোলামীর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ সৈন্য পাঠাচ্ছে। তিনি বলেন, মানুষকে মুক্ত করার জন্য আসলে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে হবে। মার্কিনীদের ছত্রছায়ায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। যাদের বাপ নেই, মা নেই এবং যারা বিধবা; স্বামী নেই তাদেরকে খ্রিস্টান বানাবার জন্য পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

জুমল্যান্ড পরিকল্পনা:

একাধিক আন্তর্জাতিক খ্রিস্টানসংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি আলাদা রাষ্ট্র করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। মুসলিম রাজ্যের বুকে তারা জুমল্যান্ড নামে একটি খ্রিস্টানরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে যেমনটি ইন্দোনেশিয়ায় 'পূর্ব তিমুর' নামে প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশেরে হৃৎপিণ্ডতুল্য খনিজ সম্পদের অপার সম্ভাবনাময় এক দশমাংশ অঞ্চল তথা পার্বত্য এলাকাকে ঘিরে তাদের এ নয়া রাষ্ট্র তৈরীর পরিকল্পনা। ৭ই মে ২০০৬ ইং তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে 'প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, সন্তু লারমার পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে স্বাধীন জুমল্যান্ডের পরিকল্পনা থাকলেও মিশনারীদের টার্গেট ভিন্ন। তাদের লক্ষ্য দক্ষিণ এশিয়ায় একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটানো।

অবশ্য প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকগণ মনে করেন, ইহুদী-খ্রিস্টান বিশ্বের লক্ষ্য শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, এর সাথে ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলোকে একত্র করে একটি বৃহৎ খ্রিস্টরাষ্ট্রের জন্ম দেবে। সে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের মত ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলোতেও বিশেষ করে ঐসব অঞ্চলের উপজাতিদের মাঝে একই ধরণের মিশনারী

গোষ্টির জোড়ালো কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাদের মতে, এদের লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ এঅঞ্চলে খ্রিস্টান রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীশক্তিগুলোর প্রতিরক্ষাবলয় সৃষ্টিকরা। ভূ-কৌশলগত দিক থেকে বিষয়টি তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

ভারতের পার্বত্য এলাকায় তথা মিজোরাম, অরুনাচল, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মণিপুরে এবং বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় দেশীয় ও ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বিমুখী তৎপরতায় ধর্মান্তরিত করার কাজ পুরোদমে চলছে। তাদের পরিকল্পনা হল, যখন এ দুই পার্বত্য এলাকার অধিকাংশ মানুষ খ্রিস্টান হয়ে যাবে তখন সন্তলারমাগং ভোটের দাবী তুলবে। এদিকে ইহুদী-খ্রিস্টানদের ক্রীড়নক জাতিসংঘ গণভোটের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করবে। এভাবে প্রতিষ্ঠাকরবে তাদের স্বপ্নের স্বাধীন খ্রিস্টরাষ্ট্র।

আমরা মুসলমানরা যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি না পাল্টাই, তাদের কাছে ইসলামের আমানত পৌছে না দেই তাহলে আমাদেরও ভোগ করতে হবে পূর্ব তিমুর ও দক্ষিণ সুদানের পরিণতি।

যে সমস্ত এনজিও সেবার নামে সরাসরি ধর্ম প্রচার করছে:

অসহায়, নিরক্ষর মানুষকে সেবা দেওয়ার নামে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে যে সংস্থাগুলো উল্লেখযোগ্য তৎপরতা চালাচ্ছে তার মধ্যে কিছু হলো –
(১) কারিতাস, (২) এন.সি.সি. (ননলাইট সেন্ট্রাল কমিটি), (৩) লুথারান মিশন, (৪) দ্বীপশিখা, (৫) সালভেশন আর্মি, (৬) ওয়ার্ল্ড ভিশন, (৭) সি.ডি.এস. (সেন্ট্রাল ফর ডেভেলপম্যান্ট সার্ভিস), (৮) আর.ডি.আর.এস. (রংপুর দিনাজপুর রোড এন্ড সার্কেল), (৯) সি.সি.ডি.ভি. (খৃষ্টান কমিশন অফ ডেভেলপম্যান্ট), (১০) হিড বাংলাদেশ, (১১) সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট, (১২) চার্চ অফ বাংলাদেশ, (১৩) পের ইন্টারন্যাশনাল, (১৪) সুইডিশ ফ্রেমিশন, (১৫) কনসার্ন, (১৬) এডরা, (১৭) অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট সোসাইটি,

(১৮) এমসিনি, (১৯) ওয়াই.ডব্লিউ.সি. (২০) ফেমিলিজ ফর চিলড্রেন, (২১) আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট ইত্যাদি।

এসব সংস্থা বাজেটের ৯০ ভাগ খৃষ্টানদের অথবা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনায়ময় ব্যক্তিদের পিছনে ব্যয় করে থাকে।

পাহাড়িদের বিভিন্ন উপজাতি:

এগুর্ণা, চাকমা, মারমা, তনচৈঙ্গা, চাক, ক্ষুমি, ভৌম, ত্রিপুরা, খাশিয়া, মনিপুরী, খিয়াং, মাংখু, লুশাই, মগ, গারো, মুরু, সাঁওতাল, রাখাইন, হাজং, রাজবংশী, মুরং, কুকি, হুদি, পাংখো, উড়াও, বোনজোগী, দালই, লুসাই, খুশী, তংচংগা, বংশাই, বোম, মুনী চাক, চোক, হরিজন, মুন্ডা ইত্যাদি – এগুলো আলাদা আলাদা জাতিগোষ্ঠী। এক গোত্র আরেক গোত্রের সাথে বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। বৈবাহিক ক্ষেত্রে তারা বংশীয় সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু "পাঙন" সম্প্রদায় ছাড়া অন্য উপজাতির অধিকাংশ লোক ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আবার ১০.৫ % হিন্দু জনসংখ্যার বিপুল পরিমাণ লোক ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

এনজিওদের কার্যক্রম:

চার্চ অফ বাংলাদেশ

ডঃ জিগা বি. আলসেনের পরিচালনায় "চার্চ অফ বাংলাদেশ" নামে একটি খৃষ্টান মিশনারি এনজিও "মৌলবাদী এনজিও", ১৯৬৫ সালে কক্সবাজারের মালুমঘাটে "মেমোরিয়াল হসপিটাল" নামে একটি খৃষ্টান হাসপাতাল তৈরি করে। এলাকার লোকজন ছিল অভাবগ্রস্ত ও নিরক্ষর। এই সুযোগে ড. ভিগা বি আলসেন তার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে সেবাদানের মাধ্যমে ৩৮ বছর এই মালুমঘাটের চকরিয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ১৯৬৪ সালে মালুমঘাটে যেখানে একজনও খৃষ্টান ছিল না, তার প্রচেষ্টায় ২০০৩ সালে সেখানে খৃষ্টানদের সংখ্যা ৪০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। তারা আশেপাশের জমি ক্রয় করে নয়া খৃষ্টানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে

চট্টগ্রামের দৌলতপুরে মরিয়াম আশ্রমের পাশে তারা বিশাল খৃষ্টান এলাকা গড়ে তুলেছে। সেখানে দুর্গম এলাকায় পাহাড়ের ভিতরে তারা গির্জা নির্মাণ করেছে।

সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট

এই "সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট" খৃষ্টান মিশনারি তাদের সহযোগীদের মাধ্যমে ৮৫ টি প্রাইমারী স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনা করে। এসব স্কুলে কোন মুসলমানের সন্তান ভর্তি নেওয়া হয় না। ১৯৯০-৯১ সনে এই "সেভেন ডে চার্চ" ২৩০ মিলিয়ন টাকা খরচ করে বহু মানুষকে খৃষ্টান বানিয়েছে।

হিড বাংলাদেশ

"হিড বাংলাদেশ" নামে এ এনজিও মৌলভী বাজারে, কমলগঞ্জে, সুন্দরবনে সেবার আড়ালে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে। সূচনাতেই তারা ৬ লক্ষ মার্কিন ডলার নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে।

সি. সি. ডি. ভি.

"সি. সি. ডি. ভি." নামক সংস্থা রংপুর, দিনাজপুরসহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে কাজ করছে। আর "ডি.আর. আর. এস." এর সমস্ত সংগঠন টাকা নেয় সুইডেন, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড থেকে। টাকা আনে মিস্টার টরবেন পিটারসের নেতৃত্বে ১৯৮৬ সালে ২১৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চলে সাঁওতাল উপজাতিদেরকে দাওয়াত দিয়ে ৩৫ হাজার সাঁওতালকে তারা খৃষ্টান বানিয়েছে।

মিশনারির স্বরূপ সন্ধানে:

পৃথিবী জুড়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার কাজে তাদের সেবার ছদ্মাবরণে বহুরূপী কর্মকাণ্ড দেখে সচেতন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে – "খৃষ্টধর্ম কি আসলেই কোন ঐশী ধর্ম ?"

তা যদি ঐশীই হয়, তাহলে মিশনারিদের খৃষ্টধর্ম প্রচার কাজে কেন এতো ব্যাপক কৃত্রিমতা, জালিয়াতি, অপপ্রচার ও প্রলোভন ? বর্তমানে খৃষ্টধর্মের ধ্বজাধারীগণ বিশ্বব্যাপী শান্তি তথা পাপ মুক্তির জন্য ত্রাণকর্তার ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তারাই আড়াই শতাব্দী আগে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা করে। যার ফলে বর্তমান খৃষ্টধর্মের কেন্দ্রভূমি পাশ্চাত্যেই ব্যক্তি স্বার্থ, বর্ণবাদের উন্মত্ততা, নৈতিক অধঃপতন তথা অনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। খৃষ্টবাদের

প্রচারকগণ এদেশেও তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থে নানা সূক্ষ্ম কুটচালের মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে।

আজ তাই প্রতিটি সচেতন ধার্মিক ব্যক্তির তাদের এই অশুভ ও মানবতাবিরোধী কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক। আসুন তাদের রূপ উদঘাটন করি।

মিশনারি শ্রেণীবিভাগ:

বিশ্বে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ১৫৬ টি প্রধান এবং ২৮,০০০ টি উপদল রয়েছে। মূল দলগুলোর মধ্যে দুটো দলই প্রধান – ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট। এদের মধ্যে শুধু ধর্ম-বিশ্বাসের পার্থক্যই নয় বরং মূল ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের মধ্যেও রয়েছে পার্থক্য। তাছাড়া তাদের বাইবেল সংস্করণগুলোর একটির সাথে অন্যটির বহুলাংশেই মিল নেই।

বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক:

যদিও প্রচলিত খৃষ্টধর্ম ছিল সেমেটিক অর্থাৎ প্রাচ্যের, কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরাই এর ধারক-বাহক হয়ে বসেছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সরকার ও সংস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতায় খৃষ্টান মিশনারীরা বিশ্ব জুড়ে গড়ে তুলছে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও প্রচারের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক।

প্রতিষ্ঠান ও প্রচার মাধ্যম:

বর্তমানে ৭০ হাজারের বেশী মিশনারি ক্রুসেডার (ধর্ম যোদ্ধার) শিকার মুসলিম বিশ্ব। এ প্রেক্ষিতে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গড়ে তুলেছে চার্চ ও বিভিন্ন ছদ্মবেশী সেবা, শিক্ষা ও আর্থিক দাতা প্রতিষ্ঠান "এনজিও" সমূহ।

সরাসরি মিশনারির মধ্যে "হ্যাগাই ইন্সটিটিউট" এমন একটি সংস্থা, যার কাজ হলো ধর্মের অসারতা প্রমাণ ও ইসলামের নবজাগরণকে প্রতিহত করা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে জার্মান, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত থেকে প্রচুর নিষিদ্ধ ও

ইসলাম বিরোধী বই এদেশে বহু কথিত বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, নাট্যকর্মী, কণ্ঠশিল্পী এবং প্রগতিবাদীদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। "হ্যাগাই ইন্সটিটিউট" ২০০০ অ্যালুমনই (সদস্য) নিয়ে ৫ টি মহাদেশের ৭০ টি প্রদেশে ১,০০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ মানুষকে দক্ষ প্রচারকরূপে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পাঠাবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি গবেষণা বুলেটিন থেকে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানা যায় যে, ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাপী খৃষ্টধর্ম প্রচার ও ইসলামী জাগরণকে প্রতিহত করতে ১,২০,৮৮০ টি প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তার মধ্যে বাংলাদেশে প্রটেস্ট্যান্ট গোত্রের ইয়াং খৃষ্টান ওয়ার্কস এবং এভরী হোম কান্ট্রাস্ট, খৃষ্টান কমিশন ফর ডেভেলপম্যান্ট ইন বাংলাদেশ (সি. সি. ডি. বি.) ইয়াং ম্যানস খৃষ্টান এসোসিয়েশন (ওয়াই. এম. সি.) উল্লেখযোগ্য। তারা বাংলাদেশের নানা স্থানে বিভিন্ন নামে অসংখ্য সংস্থা স্থাপন করেছে। যেমন –

* নুর-ই-ইলাহী, পোস্টবক্স নং ৩৫০৭, ঢাকা,

* খোদার পথ, পোস্টবক্স নং ৫৮, ঢাকা – ১০০০,

* মাসীহী জামাত, পোস্টবক্স নং ৩৫০৭, ঢাকা,

* আল হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট,

* ডাকযোগে বাইবেল শিক্ষার জন্য পোস্টবক্স ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯৯৭ সালের তথ্য ও পরিসংখ্যানের সংরক্ষণ ও প্রচারে ব্যবহৃত হয় ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ কম্পিউটার সেট। তাছাড়া ৩৪০০ রেডিও ও টেলিফোন সেন্টার খৃষ্টধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ছিল। দেশে বর্তমানে "ঈমানের পথ" নামে ইসলামী আঙ্গিকে রেডিও অনুষ্ঠান চালু করেছে।

প্রকাশনা:

বই প্রচার ও পত্রাদি বিলি

উল্লিখিত আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি গবেষণা বুলেটিন থেকে জানা যায়, খৃষ্টধর্ম বিষয়ক ১ লাখ ৯ হাজার ৯ শত ধরনের বই ও একত্রিশ হাজার তিনশত রকম ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। মুসলিম বিশ্বে বিনামূল্যে বিলিকৃত বাইবেলের সংখ্যা প্রায় ৬৩ কোটি ৯ লক্ষ ৪০ হাজার এবং মুসলমানদের জন্য ইসলামী পরিভাষায় রচিত বাইবেল অর্থাৎ "কিতাবুল মুকাদ্দাস" আঠারো কোটি তিরাশি লক্ষ তিরিশ হাজার। সর্বোপরি খৃষ্টবাদ, ইউরোপীয় ধর্মদর্শ ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্যতম মিথ্যাচারে সমৃদ্ধ অগণিত পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে চলেছে। ১৬ ই এপ্রিল ১৯৯৮ ইং সনে টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এডওয়ার্ডের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৮৯০ সাল থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে অর্থাৎ ২৫ বছরে ইসলামের বিরুদ্ধে ষাট হাজার রকম বই প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও ভিডিও, অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করা এবং "স্বর্গমত ম্যাগাজিন" উল্লেখযোগ্য।

প্রকাশনায় অপকৌশল:

ধর্মগ্রন্থ ও সংস্থার নাম পরিবর্তন

মিশনারিরা মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ সারা বিশ্বে বাইবেল নামেই বহুল পরিচিত। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে নাম পরিবর্তন করার কৌশলে খৃষ্টান মিশনারিদের জুড়ি নেই। সর্ব প্রথম বাংলা ভাষায় খৃষ্টানরা বাইবেলকে "ধর্ম পুস্তক" নামে ১৯৬৩ সালে "পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি" থেকে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে একই সংস্থা "বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি" (বি. বি. এস.) তাদের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে "পবিত্র বাইবেল" নামে প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, উভয় নামের বাইবেলে (তথাঃ ধর্ম পুস্তক – ১. "বাংলাদেশ বাইবেল", ২. "পবিত্র বাইবেল"; মৌলিকভাবে দুটো অংশ রয়েছে – ১. "নতুন নিয়ম", ২. "পুরাতন নিয়ম") পরবর্তীতে সংস্থার নাম পাল্টিয়ে "মসীহী জামাত" নামকরণ করে তাদের পবিত্র বাইবেলকে "কিতাবুল মুকাদ্দাস" নামে প্রকাশ করে। এই কিতাবুল মুকাদ্দাসে "পুরাতন নিয়ম" অংশের নামকরণ করেছে "তৌরাত, জবুর ও নবীদের কিতাব" এবং "নতুন নিয়ম" অংশের নামকরণ করেছে "ইঞ্জিল শরীফ"। প্রমাণ্য ঐতিহাসিক সত্য হলো, ওসব নামের তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল শরীফ আল্লাহ'র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অবিকৃত কিতাব নয়।

মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা নকল

খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের "কিতাবুল মুকাদ্দাস" ও "ইঞ্জিল শরীফ" এর মলাট সম্পূর্ণ ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক প্রচ্ছদে অলংকৃত করে প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন রঙের সুদৃশ্য কভারের উপর সোনালী রঙের ইসলামী ধাঁচের প্রচ্ছদ দেখে এটাকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা পবিত্র হাদিসগ্রন্থ বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়।

তারা এখন তাদের যাবতীয় ধর্মীয় বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, পত্রাদির প্রচ্ছদ, মসজিদ, কালেমা, আরবি বর্ণের শৈল্পিক নকশা দ্বারা অলংকৃত করার অপকৌশল অবলম্বন

করছে। এমনকি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি যেমন পর্দা, নামায, নারী শিক্ষা, ওযু ইত্তাদিকে বিকৃত উপস্থাপনে ও বক্তব্যে সমৃদ্ধ করে বই প্রকাশ করে চলেছে।

ইসলামী পরিভাষা ও নামাবলী ব্যবহার

খৃষ্টান মিশনারিরা এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা তাদের ধর্ম গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামী পরিভাষা, শব্দ ও নামাবলী চুরি করে তাদের ধর্মগ্রন্থ ও বইগুলো প্রকাশ করে চলেছে। তাদের পবিত্র বাইবেলের কিছু শব্দ উল্লেখ করা হলো, যে শব্দগুলোকে তারা তাদের গ্রন্থ কিতাবুল মুকাদ্দাসে ইসলামী পরিভাষা ও নামের রূপ দিয়েছে (কিতাবুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তিত রূপ ব্র্যাকেটে উল্লেখ করা হলো) –

আদিপুস্তক (আল-তৌরাত), প্রথম সিপারা (পয়দায়েশ), পরমগীত (নবীদের কিতাব সোলায়মান), গীতসংহিতা (আল জবুরঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম সিপারা), ঈশ্বর (আল্লাহ), ঈশ্বর পুত্র (ইবনুল্লাহ), পরিত্রাণ (নাজাত), ভাববাদী (নবী), ভজনা (এবাদত), বিশ্বাস (ঈমান), ব্যবস্থা (শরীয়ত), আব্রাহাম (ইব্রাহীম), মোশি (মুসা), দায়ুদ (দাউদ), যীশুখৃষ্ট (ঈসা মসীহ), দূত (ফেরেশতা), শির্ষ (সাহাবী), প্রায়শ্চিত্ত (কাফফারা), উবড় (সিজদা), যাচঞা (মুনাজাত), অলৌকিক কার্য (মোযেজা) ইত্যাদি।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জালিয়াতি

সর্বোপরি তাদের নির্লজ্জ ও জঘন্যতম জালিয়াতির দৃষ্টান্ত হলো দীর্ঘ ১৬ বছর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার পর কুরআনের বিভিন্ন আয়াত চুরি করে প্রতিটি অধ্যায়ে আরবিতে “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম” দিয়ে শুরু করে তাদের কথিত ইঞ্জিল শরীফ প্রকাশ করেছে। অথচ তাদের কোন কিছু শুরু করা হয় “পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মা” এর নামে। বিশ্বের ইতিহাসে ধর্মের নামে এতো বড় জালিয়াতির নজির আর নেই।

পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা

ইদানিং তাদের ঘৃণ্য প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী চরমে পৌঁছেছে। তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আংশিক প্রয়োগ এবং নিজেদের মনগড়া বানোয়াট অনুবাদ ও বাইবেলের স্বপক্ষে অপব্যাখ্যা দিয়ে নানা রকম পুস্তিকাদি প্রকাশ ও প্রচার করছে। যেমন ত্রিত্ববাদের

মাঝে আল্লাহ এক, ইঞ্জিল ও কুরআনে ঈসা কালিমাতুল্লাহ'র ব্যক্তিসত্তা রক্তমাংসের দেহে আবৃত, আমরা কিভাবে সালাত কায়েম করি ?

তারা এখন তাদের বইয়ে সরাসরি কুরআনের আরবি আয়াত সংযোজন করছে। মুসলমানরা কুরআনের আয়াতকে সম্মান করে বলে তাদের ঘরে মিশনারিদের রচিত বই-পুস্তক স্থান পায়। কালার সমৃদ্ধ তাদের এ বইগুলো পড়ে সরল মনের সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হয় এবং ঈমান আমল হারিয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের পথ ধরে। এভাবে মিশনারিগুলো তাদের (ঈমান ধংসের) লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয়।

তাদের প্রত্যেক বইয়ের শেষে প্রশ্নপর্ব থাকে। সেগুলোর উত্তর প্রদানে আরো বই ও উপহারের আশ্বাস দেওয়া হয়। বইয়ের বিকৃত বিষয়ের কোন প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। তবুও কেউ প্রশ্ন করলে তারা নীরবতার কৌশল অবলম্বন করে। এভাবে যে কোন মূল্যে পাঠক থেকে মিথ্যার সাক্ষ্য নিয়ে কুফরীর পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়।

এলাকা ও জনগণ নির্ধারণ

তারা সমগ্র বাংলাদেশকে প্রচারের আওতাভুক্ত করার জন্য ১৯৬৮ সালে ১লা সেপ্টেম্বর তৎকালীন ঢাকা মহাপ্রদেশের অধীনে পুরো পূর্ব পাকিস্তানকে চারটি ধর্ম প্রদেশে বিভক্ত করে, এগুলো হলো –

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশঃ এ ধর্মপ্রদেশের আওতাভুক্ত এলাকা প্রদেশের সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল।

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশঃ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে এ ধর্মপ্রদেশ। এ ধর্মপ্রদেশের পরিধি যমুনা নদীর পশ্চিমাঞ্চল তীর থেকে দক্ষিণে পদ্মা এবং পশ্চিমে ভারতীয় সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত।

খুলনা ধর্মপ্রদেশ।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ।

এ সকল এলাকায় তারা সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। আর হবেই না কেন ? তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে বিশাল অর্থের যোগান। ১৯৯৭ সালে খ্রিস্টবাদের প্রচার সংস্থাগুলোর মধ্যে শুধু ওয়ার্ল্ড ভিশনের অর্থ পরিকল্পনা ছিল ২১২৯ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার।

খ্রিষ্টধর্ম প্রচারিভাযান:

খ্রিষ্টধর্ম প্রচার অভিযান বা খ্রিষ্টধর্ম প্রচারণা হল সারা বিশ্বে অখ্রিষ্টানদের মাঝে খ্রিষ্টধর্ম ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক প্রচারণা অভিযান।দ্বিতীয় ভ্যাটিকান পরিষদ (দ্য সেকেন্ড ভ্যাটিকান কাউন্সিল, ১৯৬২-৬৫) শুধুমাত্র অখ্রিষ্টানদের মাঝে ধর্মপ্রচারণার নির্দেশনা দিয়েছে।প্রচারণাগুলোতে সাধারণত এক দেশ বা অঞ্চল থেকে আরেক দেশ বা অঞ্চলে একজন বা কয়েকজন সন্ন্যাসী প্রেরণ করা হয়; এদেরকে ধর্মপ্রচারক বা ধর্ম-অভিযাত্রীও বলা হয়। ধর্মপ্রচারণা অভিযানগুলো ধর্মান্তরকরণের সুবিধার্থে গরিব-মিসকিনদের মাঝে মানবিক ক্রিয়াকলাপও চালিয়ে যায়। বিশ্বে কয়েক ধরনের ধর্মপ্রচার অভিযান লক্ষ্য করা যায়, যেমন স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী ইত্যাদি। অনেকে তাদের সারা জীবন ধর্মপ্রচারণায় ব্যয় করে।

প্রচার ও প্রচারণার অপকৌশল:

নকল ইমাম তৈরি

তারা গোপনে খৃষ্টান দেশগুলোতে ছদ্মবেশী ইমাম তৈরি করে মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেয়। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে নষ্ট করে তাদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করাই হলো এর মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাদ্রীদের সম্মেলনে "জবাজ" নামক এক পাদ্রী বিশেষ সভায় সভাপতিত্বের ভাষণে বলেনঃ মুসলমানদের সাথে বিতর্কে আমরা বিজয়ী হতে পারবো না। তাই আমরা তাদের পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করছি। এটা আমাদের সফলতার একমাত্র পথ। সুতরাং আমাদের সবাইকে দেশে বিদেশে এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইসলামী নাম ধারণ

তারা এখন ইসলামী কায়দায় নাম রাখতে শুরু করেছে, যেমন – আবদুল ওয়াহহাব, সুলতান আহমেদ পৌল ইত্যাদি। তারা আরো একধাপ এগিয়ে নিজেদের খৃষ্টান পরিচয় না দিয়ে নিজেদের পরিচয় দেয় ঈসায়ী মুসলমান। তারা কালিমাও বানিয়েছে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা মসীহুল্লাহ।

যুবতী প্রচারক

খৃষ্টান মিশনারির নারী সদস্যরা তাবলীগের ছদ্মবেশে মুসলিম নারীদের ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষিত খৃষ্টান নারীরা (ধর্মান্তরিত করার) লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের সাথে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে, যাতে পরবর্তী জেনারেশনকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে পারে। কারণ স্বামী মুসলমান হলেও পরবর্তী জেনারেশনই তাদের টার্গেট। এমনকি মহিলা ফেরীওয়ালাদের মাধ্যমে তারা ধর্মপ্রচার করে থাকে।

সাঁওতাল ভাইদের কি খবর ?

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোক বেশীরভাগ বসবাস করে রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর তথা উত্তরাঞ্চলে।

পীরগঞ্জ থানার একটি পল্লীর কথা আলোচনা করবো, এই তথ্যটি "ধর্মান্তরের খোলা হাওয়া" ৭১ নং পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এটা সাঁওতাল উপজাতির একটি দরিদ্র পল্লী। এ অঞ্চলে এ ধরনের বেশ কয়েকটি উপজাতি পল্লী আছে। যেমন – চৈত্রকল (মাহেলিপাড়া), খালিসা (মিশনপাড়া), বসুদেবপুর (ডুমারপাড়া), অনন্তরামপুর, দুর্গাপুর, উধলাপাড়া, পৈত্রীপাড়া, কাদিরাবাদ, মুনাইল ইত্যাদি।

এরা সবাই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও সাঁওতাল, বুনো, উড়াও ও পৈত্রী ইত্যাদি নামে বিভক্ত। এদের পেশারও ভিন্নতা রয়েছে। কেউ বাঁশ-বেতের কাজ করে, কেউ করে কৃষি কাজ। এদের কারো স্থায়ী আয়ের কোন উৎস নেই। মুসলমান পাড়ায় গতর খেটে এবং বাঁশ-বেতের জিনিসপত্র বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। এরা অত্যন্ত নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির। আলোচিত পল্লী রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার "চৈত্রকল ইউনিয়নে" অবস্থিত। এ ইউনিয়নের উপজাতির সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। তারা সবাই নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে।

ক্ষুধা এদের নিত্যদিনের সাথী, দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত জীবন, দারিদ্রের নির্মম ক্ষতচিহ্ন এদের চেহারায়। বঞ্চনাকে ওরা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হিসেবে মেনে নিয়েছে। দুঃখ ও যন্ত্রণাকে ওরা ভাগ্যলিপি হিসেবে ধরে নিয়েছে। তাই এর জন্য ওদের কারো প্রতি ক্ষোভ ও খেদ নেই। আছে শুধু জীবনের অচল চাকা একভাবে চালিয়ে নেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস। জীবনের গ্লানি ও যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্য হয়তো তারা মদ ও নেশা প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে বেছে নিয়েছে। সভ্যতার আলো আজও ঐ দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করেনি। তারা এখনো আদিম প্রথায় জীবন চালায়। শিক্ষা, চিকিৎসা এ অন্ধকার পল্লী থেকে নির্বাসিত।

তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানও অত্যন্ত সীমিত। বছরে একবার তারা ডালপূজা করে। অর্থাৎ গাছের একটি ডাল আসরের মধ্যভাগে পুঁতে তাকে ঘিরে সারারাত নারী-পুরুষ

কীর্তনের মাধ্যমে অতিবাহিত করে। কৃষি মওসুমে যখন কাজ থাকে, তখন তারা মুসলমান পাড়ায় গিয়ে বিত্তবান ও স্বচ্ছল লোকদের বাড়িতে মজুরী খাটে। যখন কাজ থাকে না, আকালের সময় বনে জঙ্গলে বিভিন্ন গাছের পাতা ও বনজ আলু কুড়িয়ে আনে। হলুদ মরিচ মসলা ছাড়া শুধু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে আলু দিয়ে তারা ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করে। শীতের সময় এসব মানব সন্তানরা শীত নিবারণের জন্য আদিম প্রথায় উঁচু করে মাচা বাঁধে আর নিচে আগুন জ্বালিয়ে বসে রাত কাটায়। রংপুর, পীরগঞ্জ অঞ্চলে ছয় মাস পর্যন্ত আকাল থাকে। তখন তাদের কাজ থাকে না। আবার যারা বাঁশ-বেতের কাজ করে, তারাও তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারে না। তখন জীবন একেবারে অচল হয়ে পড়ে। মুসলমান পাড়ায় গিয়ে চেয়ে-চিন্তে ধার-কর্জ করে চলতেও তারা অভ্যস্ত নয়। অভাবের সময় এসব দরিদ্র পল্লীতে সরকারী- বেসরকারী পর্যায় ঋণদানেরও কোন প্রথা চালু নেই।

সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র রংপুর জেলার চৈত্রকল ইউনিয়নের। সেখানকার ছাব্বিশটি পরিবার প্রায় সবাই ইতিমধ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। চৈত্রকলস্থ “খলিশা মিশন” এ বিষয়ে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে চলেছে। পল্লীর নিভৃতকোণে নীরব বিপ্লব সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিশাল জমির উপর প্রতিষ্ঠিত খালিশা মিশনে স্থায়ীভাবে বহুলোক কর্মরত আছেন। এ মিশনে আছে চিকিৎসা সেবা ও দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ।

উপজাতি সম্প্রদায় আমাদের প্রতিবেশী। তারা আমাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। নিবেদিত প্রাণ এসব হতদরিদ্র আদম সন্তানদের খোঁজ নেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু আমরা কি এ দায়িত্ব পালন করছি ? অথচ প্রতিবেশীর সেবা ও খোঁজ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের গৌরবের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

ইসলাম আমাদেরকে প্রতিবেশীর কর্তব্য পালনের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন – “যে ব্যক্তি পেটপুরে খায়, অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে রাত পোহায়, সে আমার উম্মত নয়।” অন্যত্র

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন – "আল্লাহ'র শপথ, সে ব্যক্তি মুমিন নয়।" এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এ কোন ব্যক্তি।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যার ক্ষতি থেকে তার প্রতিবেশীর সম্পদ ও ইজ্জত নিরাপদ নয়।" এ থেকে প্রতিবেশীর অধিকারের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। এতে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের কোন পার্থক্য নেই। প্রতিবেশী যে পরিচয়েই হোক, তার প্রতি বিশেষ কর্তব্য পালনকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এ মহান কর্তব্যটুকু আমাদের পূর্ববর্তীদের দ্বারা যথাযথভাবে পালিত হয়েছিলো বিধায় দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

বড় আফসোস! আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের হতভাগা অংশ (নোটঃ লেখক "হতভাগ্য উম্মত" লিখেছিলেন, আমি সেটা চেইঞ্জ করে দিয়েছি)। আরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত নীতি বিচ্যুত হয়েছি। সেজন্য এতো দুর্গতি ও লাঞ্ছনা। এখানে একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় – আজ আমরা যাদের অবহেলা ও তাচ্ছিল্য ভরে দূরে সরিয়ে রাখছি, যাদের প্রতি আমাদের ন্যূনতম কর্তব্যবোধ আছে বলে মনে করছি না। হয়তো এমন দিন বেশী দূরে নয়, যেদিন এসব অবহেলিত সম্প্রদায় একটি বৃহৎ জাতিতে রূপ নিবে। তারা প্রশিক্ষিত হবে, আর অতীত বঞ্চনা ও প্রবঞ্চনার জন্য আমাদের দায়ী করবে। স্থায়ীভাবে আমাদের মাথা ব্যাথার কারণ হবে। তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত লেবানন। সেখানে খৃষ্টানরা স্থায়ীভাবে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে একটি সমৃদ্ধ মুসলিম দেশকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

ইসলাম হলো আমাদের কাছে আমানত। আমরা কি এই আমানত তাদের কাছে পৌঁছিয়েছি ? ইসলামের দাওয়াত পাওয়া তাদের অধিকার। আমরা কি তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিনি ? এখনো সময় আছে তাদের পাশে দাঁড়াবার। এখনো সময় আছে তাদের আমানত পৌঁছানোর। আসুন, আজ থেকে আমরা তাদের হক পৌঁছে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করি। জাহান্নামের পথ থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেই। যা ছিল আমার আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সুন্নাত।

ইন্টারনেটে নাস্তিক্যবাদী প্রচারনার আধিপত্য:

তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে মত প্রকাশের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে ওঠা ব্লগকে একশ্রেণীর যুবক ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার ও ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক যুবগোষ্ঠী মহান আল্লাহ, পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন, মহানুভব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঈদ, সালাত, সিয়াম ও হজ সম্পর্কে কদর্য ভাষায় বিষোদ্গার করে মুসলমানদের ঈমান ও আকীদায় আঘাত হানছে। তাদের কুৎসিত ও অশ্লীল লেখা পড়লে যে কোনো মুসলমানের স্থির থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি বিবেকবান অমুসলিমদেরও গা শিউরে ওঠার কথা। ব্লগে ইসলামী বিধান, রীতি-নীতিকে কটাক্ষ করা হচ্ছে প্রকাশের অযোগ্য ভাষায়। নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে কাল্পনিক কাহিনী ও মতামত লেখা হচ্ছে অবলীলায়।

সত্য কথা বললেই যদি হাজী সাহেবের মুখ খারাপ বলা হয় তাহলে তারা আবার কিভাবে মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী দাবি করেন? তারা কীভাবে পরমত সহিষ্ণুতার পাঠ দেন? বিপক্ষ মত সহ্য করার কথা বলেন? কীভাবে তারা অন্যদের উগ্রবাদী আর মৌলবাদী বলেন? খোদ তারাই কি প্রতিক্রিয়াশীল অশুভ শক্তি নন? তারা আজ তাদের পুরনো যত আদর্শিক শত্রু রয়েছে, সবাইকে এই আন্দোলনের মাধ্যমে ঘায়েল করতে চাইছে। কাউকে এর বিপক্ষে কোনো যৌক্তিক প্রশ্নও তুলতে দিচ্ছে না। গণদাবির চেয়ে গোষ্ঠী ও শ্রেণীগত দাবিই বেশি উচ্চারিত হচ্ছে। এই হলো নাস্তিকদের প্রকৃত সততা।

নাস্তিকরা তাদের রাজনৈতিক গুরুর বিরুদ্ধে বললে স্বাধীন মত প্রকাশের কথা বলেন না, অথচ শত কোটি মানুষের প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব, সর্বাধিক ভালোবাসার পাত্র মানবতার মুক্তির দূত নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্বোধ কিংবা বিবেকহীন সমালোচনা করা হলে, তাঁর বিরুদ্ধে অশালীন কটূক্তি করা হলে দোহাই দেয়া হয় এই মত প্রকাশের স্বাধীনতার! নেতার সমালোচনা করায় তৎক্ষণাত চাকরি হারায়, দিন না পেরোতেই জেলে বন্দি করা হয় অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমালোচনা এবং ইসলামকে তীব্র কটাক্ষকারী উন্মাদ ব্লগারদের রাষ্ট্র দেয় নিরাপত্তার জন্য গানম্যান! নাস্তিকদের ভণ্ডামি আর দ্বিমুখী নীতির দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারীরা ইন্টারনেট ব্লগগুলোয় যে ভাষা ও ভঙ্গি প্রচার করে বেড়ান, তা তাদের অন্তরালের জীবনের মতোই ঘৃণ্য। অকল্পনীয় অশ্লীল এবং অসহনীয় মিথ্যায় ভরা। অথচ এ দেশের বাম-নাস্তিক অধ্যুষিত মিডিয়াগুলো বরাবর তাদেরই পক্ষ নিয়ে এসেছে। এও এক দ্বিচারিতা। আবার এদের ভণ্ডামি আর মুখোশ উন্মোচনের উদ্যোগ নেয়ায় বামনিয়ন্ত্রিত সরকারও এমন উদ্যোগ নেয় যা শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভণ্ডামির অন্যতম। ইসলামপন্থী মিডিয়ায় নাস্তিক ব্লগারদের ইসলাম ও রাসূল অবমাননার সংবাদ প্রকাশ হলে যখন সারা দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে তখন তাদের বিরুদ্ধে নামকাওয়াস্তে ব্যবস্থা নিয়ে এসব প্রচার বন্ধের ব্যবস্থা নেয়া হয়!কী বিচিত্র মুসলিম দেশ! হায় সেলুকাস!

২০২৫ সাল পর্যন্ত খৃষ্টানদের বিভিন্ন টার্গেট ও পরিকল্পনা:-

১৯৭৮ সালে উত্তর আমেরিকার লুওয়াজিন নামক স্থানে সমকালীন খৃষ্টবাদ প্রচারের ধারাবাহিকতায় এক ঐতিহাসিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। তাতে সারা দুনিয়ার প্রায় দেড়শ প্রথম সারির খৃষ্টান ধর্মগুরু ও ধর্মনেতাগণ যোগদান করেন। তাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন দেশের বড় বড় গির্জা, মিশনারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ছিলেন। উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-গবেষণা এবং বোধ ও বুদ্ধিমত্তার আলোকে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে মুসলমানদের মাঝে খৃষ্টবাদ প্রচারের স্বার্থে এ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন যে, দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার সময় যদি তাৎক্ষণিকভাবে মুসলমানদেরকে খৃষ্টবাদের বিষাক্ত ট্যাবলেট গলধকরণ করানো নাও যায় তাহলে সমস্যা নেই; কিন্তু কমপক্ষে অতি অবশ্যই মুসলমানদের মাঝে নৈতিক ও চারিত্রিক স্খলন ঘটানো এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদেরকে পঙ্গু করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে হবে। কনফারেন্সে যোগদানকারী ধর্মনেতাগণ এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে একটি রিসার্চ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। যা পরবর্তীতে একজন প্রসিদ্ধ উগ্র ও চরমপন্থী খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক স্যামুয়েল জেইমারের নামে পরিচিতি লাভ করে।

মোটকথা, গির্জাপতি আর ধর্মনেতাগণ খৃষ্টধর্ম প্রচার-প্রসারের পথকে সহজ ও সুগম করতে কোন কল্পনা-পরিকল্পনা বাকি রাখেননি। একজন মুসলমানের অমূল্য সম্পদ ঈমানকে ছিনতাই করা, মুসলিম যুবসমাজের চরিত্রকে নষ্ট করা এবং ইসলামবৃক্ষের গোড়াকর্তন করার – সার্বিক অর্থেই যতো পথ ও পন্থা হতে পারে তারা সব আবিস্কার করেছে এবং মুসলমানদেরকে সে অনুযায়ী পরিচালিত করছে। কিন্তু পরিতাপের কথা হলো, মুসলমানরা নিজেদের সঠিক পথ ছেড়ে ইয়াহুদি-খৃষ্টানদের বাতলানো পথে চলতে লজ্জা ও অনুশোচনাবোধ তো দূরের কথা, বরং সেটাকেই গর্ব ও আভিজাত্যের বিষয় মনে করছে। যারা এ ব্যাপারে সামান্য "নাক গলায়", তাদেরকে সেকেলে, চরমপন্থী, প্রগতির পথে বাধা ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করছে।

আপনাদের সামনে একটি রিপোর্ট পেশ করছি, আশা করছি এর দ্বারা আপনি খৃষ্টানদের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা লাভ করতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি প্রতিষ্ঠান তার তেরো তম বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে রয়েছে খৃষ্টান মিশনারিদের অতীত সফলতাসহ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া। চলতি শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছরে তাদের কি কি অভিসন্ধি রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে কোন পথে এগুতে হবে, কি পরিমাণ অর্থসম্পদ তাতে ব্যয় হবে, কতজন ধর্মপ্রচারক ও মিশনারি এই মিশনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তার সম্ভাব্য ফলাফল কি দাঁড়াতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের সামান্য চিত্র তাতে তুলে ধরা হয়েছে।আমেরিকার অরজিনা ভার্সিটির খৃষ্টান প্রফেসর ডক্টর ডিওড বেরিয়েট এ প্রতিবেদনের উপর বিস্তর গবেষণা-পর্যালোচনা করার পর মন্তব্য করেছেন –

“নিশ্চয়ই এই প্রতিবেদন দুনিয়াজুড়ে খৃষ্টানদের একচ্ছত্র আধিপত্যের ইঙ্গিত বহন করছে। এ আধিপত্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনেও হতে পারে, আবার হতে পারে চিন্তানৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অঙ্গনে। খৃষ্টানদের কর্মতৎপরতা ও সফলতার একটি চিত্র দেখুন – শুধুমাত্র ১৯৯৬ সালের এক বছর সময়েই খৃষ্টানরা সারা দুনিয়ায় বাইবেলের ২৮ বিলিয়ন কপি (আঠারশত কোটি কপি) বিতরণ করেছে। আর এ কথা শুনলে তো রীতিমত অবাক হতে হয় যে, গেলো বছর পর্যন্ত পৃথিবীর নামী-দামী বড় বড় লাইব্রেরীগুলোতে যীশু খৃষ্টের নামে লেখা বই-পত্রের সংখ্যা ৬৫৭৫১ এ দাঁড়িয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৫৩০৯৪ টি বইয়ের প্রচ্ছদে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট অক্ষরে যীশু খৃষ্টের নাম লেখা আছে।”

ডক্টর বেরিয়েট আরো বলেন, উক্ত প্রতিবেদনে সে সকল অঞ্চলের আলোচনাও এসেছে যেগুলোতে এখনো পর্যন্ত খৃষ্টধর্মের দাওয়াত পৌঁছেনি। উক্ত প্রতিবেদনে অ-খৃষ্টান রাজ্যসমূহকে ‘আলিফ’ ও ‘বা’ – এই দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

“আলিফ’ দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল রাজ্য, যেগুলোতে খৃষ্টধর্মের আওয়াজ বিলকুল পৌঁছেনি। আর ‘বা’ দ্বারা সে সকল রাজ্য উদ্দেশ্য, যেগুলো খৃষ্টান রাজ্যের পার্শ্ববর্তী ও ভৌগলিক দিক থেকে তার সাথে মিলিত। উক্ত প্রতিবেদনে দাবী করা হয় যে, অ-খৃষ্টান রাজ্যসমূহে অনতিবিলম্বে খৃষ্টধর্মের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভৌগলিক তথ্য, ভাষা ও আঞ্চলিক সব রীতি অভ্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

উক্ত প্রতিবেদনের একটি পরিসংখ্যান ছিল এই যে, বর্তমানে অ-খৃষ্টান রাজ্যে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা হলো তের বিলিয়ন। আর এই জনপদগুলোতে বছরে প্রায় ৪৭ মিলিয়ন লোক বাড়ছে। এ হিসেবে দৈনিক ১২৯০০০ নবজাতক শিশু জন্মগ্রহণ করছে। উনিশ শতকে জনসংখ্যার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র এক মিলিয়ন। এ হিসেবে আশা করা যায়, বিশ শতকে অ-খৃষ্টানদের রাজ্যের জনসংখ্যা ১৪ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে ১৫ বিলিয়নে পৌঁছে যাবে। (এডিটেডঃ হিসাবে কোন একটা প্রবলেম হয়েছে, তবে এটা শিউর যে, “বিলিয়ন” হবে না। হতে পারে মিলিয়নের পরিবর্তে ভুল করে বিলিয়ন লেখা হয়েছে, কিন্তু শিউর না হয়ে কারেক্ট করতে পারছি না।)

পৃথিবীর শতকরা ৮১ ভাগ লোক কোন না কোন ধর্ম পালন করে। এ হিসেবে পৃথিবীতে বর্তমানে নাস্তিক বা স্রস্টায় অবিশ্বাসী লোকের সংখ্যা হলো ১১১০ মিলিয়ন। সারা পৃথিবীতে ১৫ হাজারেরও বেশী ধর্মের প্রচলন রয়েছে। আর দিন দিন তো নতুন ধর্মের সংখ্যা বেড়েই চলছে। এই বৃদ্ধি খৃষ্টানদের ধর্ম প্রচারে বড় বাঁধা।

আমরা এই নাস্তিকদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করব?

অতএব কুলাঙ্গার নাস্তিকদের সঙ্গে আমাদের কোনো ধরনের ভালোবাসা ও মিত্রতা রাখা যাবে না। আমরা তখনই পূর্ণ মুমিন হতে পারব যখন আমাদের সম্পর্কের মাপকাঠি হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবে সে আমার বন্ধু, যে বাসবে না সে আমার পরম মিত্র হতে পারে না। কারণ, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱللَّهِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٢٢﴾ [المجادلة: ٢٢]

'আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী এমন কোনো জাতিকে পাবে না যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে ভালোবাসে, হোন এই বিরুদ্ধাচারী তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের গোত্রীয় কেউ। এদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতসমূহে যার নিচে দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরা হল আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।'
(সূরা মুজাদালা, আয়াত : ২২)

এদের বন্ধুরূপে গ্রহণের সমালোচনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ تَرَىٰ كَثِيرٗا مِّنۡهُمۡ يَتَوَلَّوۡنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ لَبِئۡسَ مَا قَدَّمَتۡ لَهُمۡ أَنفُسُهُمۡ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ وَفِي ٱلۡعَذَابِ هُمۡ خَٰلِدُونَ ٨٠ وَلَوۡ كَانُواْ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمۡ أَوۡلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُمۡ فَٰسِقُونَ ٨١ ﴾ [المائدة: ٨٠، ٨١]

'তাদের অনেককে তুমি কাফেরদের সঙ্গে মিত্রতা করতে দেখবে, কত নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম। যে কারণে আল্লাহ তাদের ওপর রাগান্বিত হয়েছেন, তাদের শাস্তি ভোগ স্থায়ী

হবে। তারা আল্লাহ, নাবী ও তাঁর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান আনলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অনেক ফাসেক।’
(সুরা মায়িদাহ, আয়াত : ৮০-৮১)

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ

‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা করল আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম।
[বুখারী : ৬৫০২]

এই নাস্তিকরা এত বড় অপরাধী যে এদের জন্য এমন কি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা বা রহমতের দু‘আ করা যাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ١١٣ ﴾ [التوبة: ١١٣]

‘নবী ও মু’মিনদের জন্য আত্মীয় স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সংগত নয় যখন তা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামী।’ (সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ১১৩)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, যারা আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধ আচারণ করবে তাদের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ তথা ভালোবাসা ও মিত্রতা রাখা যাবে না।এমনকি স্বঘোষিত নাস্তিক হিসেবে মৃত্যু বরণকারীদের জন্য ক্ষমা ও রহমতের দু‘আ করা যাবে না।

নাস্তিকদের প্রতিরোধের উপায়:-

এখন থেকেই এই আন্দোলনের নতুন রূপ দেয়া দরকার। ইসলামী ঘরানার অনেক ভাইয়ের ফেসবুক আইডি আছে। নামে বেনামে কিছু likepage তৈরি করে সেগুলোকে কেন্দ্র করে সকলকে জমায়েত করতে হবে। এই পেজগুলোয় সাধারণ মানুষের প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সারাদেশের মেধাবী ছেলেদের দিয়ে এডমিন প্যানেল তৈরি করতে হবে।

আঠারোর্ধ্ব বয়সী মুসলিমকে মার্জিত অনলাইনার হতে উৎসাহিত করতে হবে। পেজগুলোয় ধর্মীয় বিষয়ের চেয়ে সামাজিক বিষয় বেশি পোস্ট দিতে হবে। সাধারণ ব্রাউজারদের সামনে নাস্তিকদের ভণ্ডামি ও আসল মুখোশ উন্মোচন করে দিতে হবে। অনেকের কাছে এই প্রস্তাবগুলো অবান্তর মনে হতে পারে। তাদের বলব, কয়েকদিন নিয়মিত সাধারণ অনলাইনার হয়ে এই পরিবেশগুলো ঘুরে দেখুন। অতপর আপনিও আমার সঙ্গে একমত হয়ে বলবেন এসব করা উচিত। অসম্ভব মনে হলেও কিছু করার নেই। ভুলে যাবেন না আরব বসন্তের সিরিয়া, লিবিয়া, মিসর এমনকি তথাকথিত শাহবাগের আন্দোলনের ডাকও কিন্তু অনলাইনেই দেয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, প্রথম কাজ হবে নাস্তিকদের কুকীর্তি জাতির সামনে প্রকাশ করা, দ্বিতীয় কাজ তালিকা করে ওই সব কুলাঙ্গারের ব্লগ বাতিলের জন্য সরকারকে আল্টিমেটাম দেওয়া, তৃতীয় কাজ ইসলামী ব্লগ তৈরি করা এবং চতুর্থ কাজ আগামী তরুণ প্রজন্মকে বাঁচাতে সতর্কতার সঙ্গে ওই খারাপ ব্লগগুলো থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে হবে শিক্ষকতা ও মিডিয়ার প্রতি। কারণ, এ দুই পেশায় যুক্ত হয়েই বামধারার লোকেরা তাদের শিক্ষা ও চিন্তা-চেতনা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইসলামবিরোধী

নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন করেছেন। মেধাবী ইসলামপ্রিয় শিক্ষানুরাগী লোকদের আজ ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এ দুই পেশায়। আমরা যত দেরি করব, তত বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে। অতিসত্ত্বর আমাদের এদিকে মনোযোগী হতে হবে।

এ পরিস্থিতিতে আমাদের যা করণীয় বা বাস্তবতার ভিত্তিতে যে উপযোগী কৌশল ও শর'ঈ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তা নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

(১) সকল মুসলিম, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের সন্তানদের অন্তরে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস মৌলিকভাবে গেঁথে দেওয়া। আর তা করতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাধারণ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সকল প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাগারে সরকারী ও জাতীয় ভিত্তিতে।

(২) মুসলিম জাতির সর্বস্তরে দীনের বাস্তব জ্ঞানের সম্প্রচার এবং হৃদয়ে দীনী আত্মমর্যাদা, পবিত্রতা ও মর্যাদাবোধ পুরোপুরি জাগ্রত করা।

(৩) খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের যাবতীয় উপকরণ: ফিল্ম, পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা-প্রচারণা ইত্যাদির প্রবেশ পথ চিহ্নিত করতঃ এগুলোর অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং এর অবাধ্যতায় দমনমূলক শাস্তিবিধান করা।

(৪) জনসাধারণকে তাদের পাতানো ফাঁদ থেকে বাঁচানো ও সাবধান করার জন্য খ্রিস্টানদের মিশনের ভয়াবহতা, অপকৌশল ও পন্থাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা।

(৫) মুসলিমের জীবনের সকল মৌলিক দিকগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা, বিশেষ করে স্বাস্থ্যগত দিক ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে যত্নবান থাকা, কেননা বাস্তবে যা ঘটছে তা হলো খ্রিস্টানরা এ দুটি মারাত্মক পথেই মানুষের অন্তরে ও মগজে ঢুকে পড়েছে।

(৬) প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ, সে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো পরিস্থিতির শিকার হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে তার দীন ও আকীদাকে মজবুতভাবে ধারণ করা এবং সে ব্যক্তিগত ও তার অধীনস্থদের জীবনে ইসলামী নিয়ম-নীতি ও নির্দেশাবলীকে যতদূর সম্ভব সু-প্রতিষ্ঠিত করা, যার ফলে তার বাড়ীর প্রতিটি সদস্য যেন ব্যক্তিগতভাবে

তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত ঈমান, আকীদা ও চরিত্র বিনষ্টকারী সংগ্রামের মুকাবিলায় সুরক্ষিত থাকতে পারে।

(৭) বিশেষ জরুরি প্রয়োজন, যেমন চিকিৎসা বা এমন প্রয়োজনীয় শিক্ষা যা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে অবর্তমান, এমন উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি ও পরিবারের কাফির রাষ্ট্রে ভ্রমণ করা থেকে সাবধান থাকা। আর উক্ত প্রয়োজনে যদি ভ্রমণ করতে হয় তবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধর্মীয় ফিতনা ও সংশয় প্রতিহত করার প্রস্তুতি সাথে থাকতে হবে।

(৮) মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক সহযোগিতা, সৌহার্দ্য ও সংহতি গড়ে তুলতে হবে; যার ফলে মানবাধিকার রক্ষিত হবে এবং মুসলিমদের যাবতীয় অভাব দূরীকরণে সমবায়ভিত্তিক জনকল্যাণমুখী দাতব্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে, এর ফলে তাদের অভাব ও দারিদ্র বিমোচনের নামে খ্রিস্টানদের কালো থাবা তাদের ওপর প্রসারিত হবে না।

◯ ওরা ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না:-

আমাদের সাহস হারাবার কিছু নেই। ইসলামের শত্রুরা যতই আদাপানি খেয়ে চেষ্টা করুক আমরা ঠিক থাকলে ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। তাদের সব কৌশল বিফলে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٥٤﴾ [ال عمران: ٥٤]

‘আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী।’ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫৪)

ওদেরর ইসলাম নির্মূলের চেষ্টা কোনোদিন সফল হবে না। বরং ইসলাম তার আলোয় উদ্ভাসিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَيَأۡبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٣٢ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ٣٣ ﴾ [التوبة: ٣٢، ٣٣]

'তারা আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায় তাদের মুখের (ফুঁক) দ্বারা, কিন্তু আল্লাহ তো তাঁর নূর পরিপূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছু চান না, যদিও কাফিররা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীনের ওপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।'
(সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৩২-৩৩)

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُرِيدُونَ لِيُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨ ﴾ [الصف: ٨]

'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।'
(সূরা আস-সফ, আয়াত : ৮)

আমাদের কাজ হবে সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করা এবং সম্ভাব্য সব কৌশল প্রয়োগ করা। নিচে উল্লেখিত আল্লাহর বাণী থেকেই আমরা নিজেদের কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥ ﴾ [النحل: ١٢٥]

'তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন।'
(সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১২৫)

ইসলামের শত্রুদের নির্মূলে চেষ্টা যদি সর্বোচ্চ হয় তবে আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করবেনই। প্রয়োজনে তিনি ফেরেশতা দিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন। নিচের আয়াতগুলোয় লক্ষ্য করুন। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,
আমাদের সাহস হারাবার কিছু নেই। ইসলামের শত্রুরা যতই আদাপানি খেয়ে চেষ্টা করুক আমরা ঠিক থাকলে ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। তাদের সব কৌশল বিফলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٥٤ ﴾ [ال عمران: ٥٤]

'আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী।'
(সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫৪)

ওদেরর ইসলাম নির্মূলের চেষ্টা কোনোদিন সফল হবে না। বরং ইসলাম তার আলোয় উদ্ভাসিত হবে ইনশাআল্লাহ।আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَيَأۡبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٣٢ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ٣٣ ﴾
[التوبة: ٣٢، ٣٣]

'তারা আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায় তাদের মুখের (ফুঁক) দ্বারা, কিন্তু আল্লাহ তো তাঁর নূর পরিপূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছু চান না, যদিও কাফিররা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীনের ওপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।'
(সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৩২-৩৩)

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُرِيدُونَ لِيُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨ ﴾ [الصف: ٨]

'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।'
(সূরা আস-সফ, আয়াত : ৮)

আমাদের কাজ হবে সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করা এবং সম্ভাব্য সব কৌশল প্রয়োগ করা। নিচে উল্লেখিত আল্লাহর বাণী থেকেই আমরা নিজেদের কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥ ﴾ [النحل: ١٢٥]

‘তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন।’
(সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১২৫)

ইসলামের শত্রুদের নির্মূলে চেষ্টা যদি সর্বোচ্চ হয় তবে আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করবেনই। প্রয়োজনে তিনি ফেরেশতা দিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন। নিচের আয়াতগুলোয় লক্ষ্য করুন। আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,
আমাদের সাহস হারাবার কিছু নেই। ইসলামের শত্রুরা যতই আদাপানি খেয়ে চেষ্টা করুক আমরা ঠিক থাকলে ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। তাদের সব কৌশল বিফলে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ٥٤﴾ [ال عمران: ٥٤]

‘আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী।’
(সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫৪)

ওদেরর ইসলাম নির্মূলের চেষ্টা কোনোদিন সফল হবে না। বরং ইসলাম তার আলোয় উদ্ভাসিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطۡفِ‍ُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَيَأۡبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٣٢ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ٣٣﴾ [التوبة: ٣٢، ٣٣]

‘তারা আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায় তাদের মুখের (ফুঁক) দ্বারা, কিন্তু আল্লাহ তো তাঁর নূর পরিপূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছু চান না, যদিও কাফিররা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীনের ওপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে।’
(সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৩২-৩৩)

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يُرِيدُونَ لِيُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨﴾ [الصف:٨]

‘তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।’
(সূরা আস-সফ, আয়াত : ৮)

আমাদের কাজ হবে সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করা এবং সম্ভাব্য সব কৌশল প্রয়োগ করা। নিচে উল্লেখিত আল্লাহর বাণী থেকেই আমরা নিজেদের কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে পারি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥﴾ [النحل:١٢٥]

‘তুমি তোমরা রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সঙ্গে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন।’
(সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১২৫)

ইসলামের শত্রুদের নির্মূলে চেষ্টা যদি সর্বোচ্চ হয় তবে আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করবেনই। প্রয়োজনে তিনি ফেরেশতা দিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন। নিচের আয়াতগুলোয় লক্ষ্য করুন। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ ١٢٤ قَالَ رَبِّ
لِمَ حَشَرۡتَنِيٓ أَعۡمَىٰ وَقَدۡ كُنتُ بَصِيرٗا ١٢٥ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتۡكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَاۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمَ تُنسَىٰ
١٢٦ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي مَنۡ أَسۡرَفَ وَلَمۡ يُؤۡمِنۢ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦۚ وَلَعَذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبۡقَىٰٓ ١٢٧ أَفَلَمۡ
يَهۡدِ لَهُمۡ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ يَمۡشُونَ فِي مَسَٰكِنِهِمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ١٢٨
وَلَوۡلَا كَلِمَةٞ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامٗا وَأَجَلٞ مُّسَمّٗى ١٢٩ ﴾ [طه: ١٢٤، ١٢٩]

'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, 'হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন?

তিনি বলবেন, 'এমনিভাবেই তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল'। আর এভাবেই আমি প্রতিফল দান করি তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং তার রবের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে না। আর আখিরাতের আযাব তো অবশ্যই কঠোরতর ও অধিকতর স্থায়ী। এটি কি তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করল না যে, আমি তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে? নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন। আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত ও একটি কাল নির্ধারিত হয়ে না থাকত, তবে আশু শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হত।'
(সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১২৪-১২৯)

◯আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা:-

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রাণাধিক ভালোবাসা আমাদের ঈমানের শর্ত। আল্লাহ ও রাসূলকে যারা কটাক্ষ করে তাদের যদি বুঝিয়ে ফেরানো সম্ভব না হয় তবে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ يُخۡرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ أَن تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمۡ إِن كُنتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِهَٰدٗا فِي سَبِيلِي وَٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِيۚ تُسِرُّونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعۡلَمُ بِمَآ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أَعۡلَنتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١﴾ [الممتحنة: ١]

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে সংগ্রামে ও আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হও (তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।) তোমরা গোপনে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে।' (সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত : ১)

অমুসলিমদের সঙ্গে আমরা সুন্দরভাবে সৎ প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করতে ধর্মীয়ভাবে বাধ্য। তবে যারা ধর্মবিদ্বেষী তাদেরকে কখনো বন্ধু হিসেবে গ্রহণের সুযোগ নেই। আমাদের বন্ধুতা-মিত্রতা হবে কেবল ঈমানদারদের সঙ্গে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ٥٥﴾ [المائدة: ٥٥]

‘তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে।’
(সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৫৫)

হাদীসে এসেছে, আনাস রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

‘তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু’মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় না হই।
[বুখারী : ১৫; মুসলিম : ৬৯]

অন্য হাদীসে এসেছে, জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

‘সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম চরিত্র হচ্ছে মুহাম্মদের চরিত্র।’
[বুখারী : ৬০৯৮; মুসলিম : ৮৬৭]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের মুসলিম ও মু’মিন হিসেবে পরিচয় দিতে চাইলে সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতে হবে। শুধু তাই নয় ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশও ঘটবে। একটা উদাহরণ দিলে বুঝে আসবে, তা হলো, আমার পিতা-মাতাকে কেউ গালি

দেয় সে সময় আমি যতটুকু রাগ করি তার চেয়েও শতগুণ বেশি রাগ আসবে যখন কেউ আমার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে কেউ কোনো কটুক্তি করবে। তবেই আমার ভালোবাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব।

নাস্তিক্যবাদী অপতৎপরতা মোকাবেলায় করণীয়:-

উদ্বেগের বিষয় হলো এমন ধর্মহীনের সংখ্যা কেবল বেড়েই চলেছে।

নাস্তিকদের ওপর হামলা এর কোনো সুষ্ঠু সমাধান নয়। প্রয়োজন তাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করা। মিডিয়াযুদ্ধে নেমে তাদের পরাস্ত করা। এত দিন যারা ফেসবুক ব্লগকে অবহেলা করেছেন, সময় হয়েছে তাঁদের নড়েচড়ে বসার। সময় হয়েছে জাতির কাণ্ডারিদের মিডিয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করে মিডিয়া প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার।

অবশ্য শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে হবে না। এদের ভাষা ও বক্তব্য এতটাই নোংরা যে এসবের জবাব দেয়াটাও কোন ভদ্র মানুষের রুচিতে আসে না। সুতরাং রাজনৈতিকভাবেও এদের মোকাবেলা করতে হবে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে সরকারকে বাধ্য করতে হবে এদের আইনের আওতায় আনতে। ব্লগগুলোয় আমি কিছুদিন এদের সঙ্গে কথা বলেছি। এদের নোংরামি এতটাই জঘন্য যে আপনি এদের সঙ্গে কথা বলার রুচি হারিয়ে ফেলবেন। আমাদের জোটবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে এদের মোকাবেলা করতে হবে। আর এদের অনলাইনের কুকীর্তি অফলাইনে জনসাধারণের সামনে আনতে হবে। তখনই এদেরকে যথাযথভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। মোদ্দাকথা কুকুরের মাথায় হাত বুলালে কোনোই লাভ হবে না। কখনো ‘যেমন কুকুর তেমন মুগুরে’র ব্যবস্থাও করতে হবে।

৯০ শতাংশ মুসলিম-অধ্যুষিত হলেও এ দেশে অন্য সব সংখ্যালঘু ধর্মগোষ্ঠী সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বসবাস করে। ধর্মের দিক থেকে এখানে কেউ কারো প্রতিপক্ষ নয়। সকল ধর্মেরই দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে, কমবেশি নিজস্ব সংস্কৃতিও আছে। কেবল একটি ধর্ম- হ্যাঁ, ধর্মই -এর বাইরে। এ ধর্মের নাম নাস্তিক্য। বাংলাদেশে নাস্তিক্যের কোনো ভিত্তি নেই, ঐতিহ্য নেই, সংস্কৃতি নেই। ভুঁইফোঁড়ও নয়, বরং এটা একটা আমদানিকৃত উপদ্রব।

নাস্তিকতা সেই একমাত্র অধর্মের ধর্ম, যা কোনো নীতিবোধে বিশ্বাস করে না। ফলে, আইনের চোখ ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হলে একজন নাস্তিকের খুন বা ধর্ষণ না-করবার কোনো কারণ নেই। অতএব নাস্তিক আর অমানুষ সমার্থক শব্দ। কিন্তু মানুষের মুখোশ পরে থাকে বলে এ অমানুষদের আমরা প্রায়ই চিনতে ভুল করি। মানুষের সমাজে মানুষের সঙ্গে মিশে থাকার প্রয়োজনেই অমানুষ নাস্তিকদেরকে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়। ছদ্মবেশ অপরিহার্য। এরা বাস করে গা ঢেকে, আত্মপরিচয় লুকিয়ে। কাপুরুষের মতো মাঝেমধ্যে লোকদেখানো সালাত আদায় করে। মরলে জানাযায়ও অংশ নেয়। তাই নাস্তিক মানেই ভণ্ড। কারণ সে খোলাখুলি কখনোই বলতে পারে না যে, সে নাস্তিক।

তবে আশার কথা, ষোল কোটি মানুষের মধ্যে নাস্তিকের সংখ্যা আঙুলে গোনা যাবে, এত কম। অন্যদিকে শঙ্কার কথা হল, কম হলেও এরা কখনোই বসে নেই। মানুষের বিশ্বস্ত সমাজে সারাক্ষণই এরা সিঁদ কাটছে ইঁদুরের মতো। এদের নির্বিরাম তৎপরতায় বাংলাদেশে এখন অনেক ইঁদুরের গর্ত। দেশের স্বাধীনতার ভিত্তিভূমির সুরক্ষার প্রয়োজনে এই ইঁদুরগুলিকে তাড়িয়ে দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কাজেই বাংলাদেশের বিশ্বাসী জনগণের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় আন্দোলন হলো 'নাস্তিক খেদাও আন্দোলন', সবচে' গুরুত্বপূর্ণ শ্লোগান হলো : 'নাস্তিকমুক্ত বাংলাদেশ চাই!

◯দাওয়াত:

মানব থেকে মানবতা। প্রতিটি মানুষের মানবতার দাবি হলো, সে অন্য মানুষের উপকার করবে। কেউ যদি কোন বিপদে পড়ে তাহলে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। আমরা জানি, প্রতিটি অমুসলিম মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

অর্থ: আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ী ভাবে থাকবে। তারা সৃষ্টির অধম।'
-(সূরা-বাইয়্যিনাহ-৬)

ধরুন!আপনার প্রতিবেশী হিন্দু বা খ্রিস্টানদের বাড়িতে যদি আগুন লেগে যায়, তাহলে আপনি কি বসে থাকবেন? না আগুন নিভাতে যাবেন? অবশ্যই আগুন নিভাতে যাবেন। আল্লাহ না করুন, যদি কোন মুসলিম মহল্লায় আগুন লেগে যায়, তাহলে প্রতিবেশী অমুসলিম ভাইয়েরা কি বসে থাকবেন? না আগুন নিভাতে যাবেন? অবশ্যই আগুন নিভাতে আসবে। দেখুন! আমরা দুনিয়াতে ক্ষণস্থায়ী আগুন থেকে উদ্ধার করার জন্য কত সুন্দর মানবতার পরিচয় দিয়ে থাকি। কিন্তু একটু কি চিন্তা করেছি যে, দুনিয়ার আগুনে জ্বলে যদি কারো ত্বক নষ্ট হয়ে যায়, বা ঘর-বাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, তাহলেঔষধ দ্বারা পুনরায় ত্বক ফিরিয়ে আনা সম্ভব। পুড়ে যাওয়া বাড়ি থেকে উত্তম বাড়ি বানানো সম্ভব। কিন্তু যে ভাইটি ইসলাম গ্রহণ না করে চিরস্থায়ী আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে, যার থেকে ফেরানো বা বাঁচানোর কোন পথ নেই, সেই চিরস্থায়ী আগুন থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য কি কখনো ভেবেছি?

আমাদের আশেপাশে আমাদেরই অনেক অমুসলিম বন্ধু আছেন,যাদের সাথে একত্রে চলা-ফেরা করি। একই অফিসে চাকরি করি। তাদের দোকান থেকে কেনা-কাটা করি। তাদের বিপদে-আপদে সহযোগিতার হাত বাড়াই। আমরা একথাও জানি, ঈমান না নিয়ে মৃত্যু এই ভাইটি মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী আগুনে জ্বলবে।

একবার ভেবে দেখা যাক!এ আমাদের কেমন মানবতা?আমার সামনে আমার এক ভাই বা বোন জাহান্নামের চিরস্থায়ী আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে,কিন্তু কোন দিন এই ভাইটিকে বলিনি যে, ভাই! তুমি যে পথে চলছো এটা জাহান্নামের পথ। কোন দিন তাকে জান্নাতের পথ ইসলাম দেখাইনি। কেমন জানি তাকে আগুনে জ্বলতে দেখেও আমি চুপ হয়ে আছি।

এটা আমাদের কেমন মানবতা? আর কতো দিন এভাবে দেখব? বলুন! এভাবে আর কত দিন বসে বসে তাদেরকে আগুনে ঝাঁপ দিতে দেখবো?

তাই রাসূল সা: এর উম্মত হিসেবে সর্ব প্রথম আমাদের যে কাজটি করতে হবে তাহলো দাওয়াত। তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। আমরা তো ছিলাম দা'য়ী জাতি। দাওয়াত ছিল আমাদের পেশা ও নেশা। আজ আমরা দাওয়াতকে ভুলে গিয়েছি। ফলে আমাদেরকে দাওয়াত দিয়ে বানানো হচ্ছে খ্রিস্টান। চিরন্তন নিয়ম হলো দা'য়ী না হলো মাদউ হতে হয়। তাই আমাদেরকে যা করতে হবে, তা হলো দাওয়াত। তাদেরগুলো হলো মাকড়শার জালের মতো। মাকড়শা অনেক কষ্ট করে ঘর বানায়। কিন্তু তা ভাঙ্গার জন্য অনেকবড় বাহাদুর হতে হয় না। ছোট্ট একটি বাচ্চা যদি একটি ঝাড়ুনিয়ে নাড়াচাড়া দেওয়া শুরু করে, তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যে জাল তছনছ হয়ে যায়। তাই আমাদেরকে এখলাসের সাথে আল্লাহকে খুশি করার নিয়তে দাওয়াতের ঝান্ডা নিয়ে তাদের সামনে পেশ হলে তারা ইসলাম গ্রহন করতে বাধ্য হবে। এর বহু প্রমান আমার কাছে আছে।অন্ধকার দূর করতে হলে লাঠি লাগে না। প্রয়োজন হয় আলো। ঠিক খ্রিস্টানদের দাওয়াতের মোকাবেলা করতে হলে প্রয়োজন দাওয়াত। আর এই দাওয়াত না দেওয়ার কারনে আমরা আল্লাহর শাস্তিতে ভুগছি।

◯দাওয়াত না দেওয়ার কারণে আল্লাহর শাস্তি:

মুসলিম জাতির দায়িত্ব ও ফরিযা হলো 'দাওয়াত'। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর বান্দাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানো। মুসলমানরা যদি এই গুরুদায়িত্ব আদায় না করে, তাহলে তার অবস্থা কী হতে পারে, এ বিষয়ে পাঠকদের খেদমতে কিছু আলোচনা পেশ করছি।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হাকীমে মানুষের দুটি অবস্থার আলোচনা করেছেন।

(১) সম্মানের অবস্থা। (২) লাঞ্ছনার অবস্থা। প্রথম অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ: ইজ্জত সম্মান তো শুধু আল্লাহর ও তাঁর রাসুল এবং মু'মিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না।
-সূরা মুনাফিকুন-৮

দ্বিতীয় অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হাকীমে বলেন।

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ.

অর্থ: আর তাদের ওপর আরোপ করা হলো লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা।

তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল।"
-সূরা বাকারা-৬১

কুরআনে কারীমে দুই প্রকার জাতির ওপর শাস্তির আলোচনা করেছেন।

প্রথম প্রকার হলো অস্বীকারকারী কাফের। অর্থাৎ যারা আল্লাহর পয়গামকে মিথ্যা বলেছে, অস্বীকার করেছে।

দ্বিতীয় প্রকার হলো, আহলে কিতাবিদের মধ্যে যারা পয়গম্বরদের দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে এক সময় তারা নাফরমান হয়ে যায়। এই আয়াতে

যাদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে, তারা হলো ওই সব মুসলমান যাদেরকে আমরা বনী ইসরায়েল বলে চিনি। এখানে ভাববার বিষয় হলো তাদের এমন কোন্ অপরাধ ছিল, যার কারণে তাদের ওপর শাস্তি নেমে এসেছে? আমাদের পক্ষ থেকেও যদি একই অপরাধ প্রকাশ পায়, তাহলে কি আমাদেরকে এই শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হবে? না, কখনও না। আল্লাহর আদালতের মূলনীতি হলো একটি অপরাধের জন্য একটি শাস্তি নির্দিষ্ট। ওই অপরাধ যেই করুক তাকে ওই শাস্তিই দেওয়া হবে। যেমন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি ফাতেমাও চুরি করে, তাহলে তারও হাত কেটে দেওয়া হবে। এখন আমরা আলোচনা করবো, কী কারণে পূর্ববর্তী লোকদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

শাস্তির কারণ:

আমরা দেখতে পাই, দুনিয়াতে মানুষ যখন তার ওপরস্থ কর্মকর্তার অবাধ্য হয়, তখন তাকে তার অপরাধের জন্য শাস্তির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। ঠিক বান্দা যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো উপাসনা করে, অথবা তার অবাধ্য হয়, তখন তিনি শাস্তি দেন। আমরা কোরআনকে নিয়ে গবেষণা করলে জানতে পারব যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী জাতিকে তিন কারণে শাস্তি দিয়েছেন।

১। অন্যায় কাজ থেকে বাধা না দেয়া

আল্লাহ তাআ'লা বলেন:

َكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُون অর্থ: তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল।
-সূরা মায়েদা-৭৯

এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম, পূর্ববর্তী উম্মতেরা মানুষকে মন্দ কাজ হতে বাধা দিতো না।এবার আমরা দেখি আমরাও একই অপরাধে অপরাধী কি না। সবচেয়ে বড় منكرমন্দ কাজ হচ্ছে শিরিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم অর্থ: তুমি আল্লাহর সাথে শিরিক করো না, নিশ্চয় শিরিক মহা অন্যায়।

-সূরা লুকমান-১৩

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাতকে হারাম করে দেন। তার আবাসস্থল জাহান্নাম আর যালেমদের কোনো সাহায্যকারী নাই।

-সূরা মায়েদা-৭২

আমার সামনে যারা শিরিক করছে, মুর্তির পূজা করছে, তাদেরকে শিরিক নামের মন্দ কাজ থেকে বাঁধা দিই কি না? ইত্যাদি। মোটকথা পূর্ববর্তী যেসব কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, সেই কারণগুলোর মধ্যে ১নং কারণটি আমাদের মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে। তাই আমরা নিজেরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবনা এবং অন্যদেরকে শিরিক করতে দেবো না। আর তাদেরকে একত্ববাদের দিকে আহ্বান করব। পূর্ববর্তী উম্মতের শাস্তি দেওয়ার দ্বিতীয় যেই কারণই ছিল, তা হলে সত্যকে গোপন করা।

২। সত্য গোপন করা।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ

لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

অর্থ: নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাজিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও।
-সূরা বাকারা-১৫৯

উক্ত আয়াতে আল্লাহর বিধানগুলো গোপন করতে নিষেধ করেন। যারা তা করবে, তাদের ওপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। আমরা এই আয়াত থেকে জানতে পারলাম যে, পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর যেই কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তার দ্বিতীয় কারণ হলো সত্যকে গোপন করা। এখন দেখার বিষয় হলো আমরা এই অপরাধে অপরাধী কি- না? আমরাও এই অপরাধে অপরাধী। আমরাও সত্যকে গোপন করছি। যেমন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন, হিন্দু-মুসলিম সকল মানুষের নবী। এই সত্য কথাটি কি আমরা হিন্দু, খ্রিস্টান অমুসলিম ভাইদের কাছে বলেছি? তাদের কাছে কি এই দাওয়াত পৌঁছিয়েছি? যদি উত্তর হয় না; তাহলে আমরা সত্যকে গোপন করলাম কি- না?

এমনিভাবে কুরআন হলো সকল মানুষের জন্য। এই সত্য কথাটি কি অমুসলিমদের মাঝে পেশ করেছি? কোনো দিন কি কোনো অমুসলিমদেরকে বলেছি? ভাই! কুরআন হলো আপনারোও কিতাব। আপনাদের জন্য মুক্তির পথনির্দেশিকা। যদি না বলে থাকি, তাহলে আমরা এই সত্য বিষয়টি গোপন করলাম কি না? হ্যাঁ অবশ্যই এই সত্য বিষয়টি গোপন করেছি।

ইসলাম হলো মুসলিম অমুসলিম সকল মানুষের জন্য। আমরা কি অমুসলিমদের কাছে এই সত্য পয়গামটি পৌছিয়েছি? যদি না পৌঁছাই, তাহলে এই সত্য বিষয়টি গোপন করলাম কি না? আমরা যদি ভালোভাবে আল্লাহর বিধানগুলোর প্রতি খেয়াল করি, তাহলে দেখব, এমন অনেক সত্য বিষয় আছে, যা আমরা গোপন করছি। অন্য মানুষের কাছে প্রকাশ করছি না। আর পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে শান্তির দ্বিতীয় কারণ হলো সত্যকে গোপন করা। আসুন আমরা সত্যকে মানুষের কাছে প্রকাশ করি যা আমরা গোপন করছি। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আমিন!! পূর্ববর্তী উম্মতকে যে কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তার তৃতীয় কারন হলো আল্লাহ বিধি বিধান থেকে উদাসীন হওয়া।

৩। আল্লাহ তাআ'লার বিধিবিধান থেকে উদাসীন হওয়া:

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ

بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ

অর্থ: অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম, গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের নাফরমানির দরুণ।

-সূরা আরাফ-১৬৫

অতএব আমরা এই আয়াত থেকে জানতে পারলাম যে, পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর আযাব আসার তৃতীয় কারণ হলো আল্লাহর আহকামকে অবজ্ঞা করা। উদাসীন হওয়া। এখন দেখার বিষয় আমরাও ওই রোগে রোগী কি না? আমরা নামাজ থেকে উদাসীন। রোজা থেকে উদাসীন। হজ্জ থেকে উদাসীন, আল্লাহর আহকাম থেকে উদাসীন। এসব কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর শান্তি দিয়েছিলেন। তখনই মানুষ উদাসীন হয় যখন মানুষ কোনো কিছু ভুলে যায়।

শাস্তির ধরণ

আল্লাহা তাআ'লা আমাদেরকে সতর্ক করেছেন বিভিন্নভাবে, কখনো আযাবের ভয় দেখিয়ে, আবার কখনো পূর্বের সম্প্রদায়ের শাস্তির ঘটনা বর্ণনা করে আমাদেরকে হুশিয়ারি বার্তা জানিয়েছেন। তার কিছু বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো। আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী জাতীকে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ِوَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

َوَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِين

আমি অবশ্যই তোমাদের পূর্বে বহু অধিবাসীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, এ কারণে যে তারা যুলুম করেছিল। অথচ রাসূল তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনল না। এমনিভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি পাপী সম্প্রদায়কে।
-সূরা ইউনুস-১৩

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা পূর্ববর্তী জাতিদের শাস্তির কারণ বলেছেন, তাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের আনীত বিধানসমূহ অমান্য ও অস্বীকার করার দরুণ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। আমরা জানি আল্লাহ তাআ'লার কাছে সবচেয়ে বেশি অপছন্দনীয় কাজ হলো, তাঁর সাথে নিরিক করা। এই দাওয়াত নিয়েই সমস্ত নবী রাসূলরা এসেছেন। যারা তাদের দাওয়াত অমান্য করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আযাবে নিপতিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পরের আয়াতে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, তোমাদেরকে এধরাতে প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমরা কীরূপ আমল কর। অর্থাৎ আমরা শিরিক থেকে নিজে বাঁচবো এবং অন্যকে বাঁচাবো। ইনশাআল্লাহ।

পূর্ববর্তী উম্মতকে তিন ধরনের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِن قُلْ هُوَ الْقَادِرُ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِفُ
الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُون

অর্থ: আপনি বলুনঃ তিনি সক্ষম তামাদের ওপর কোন শাস্তি প্রেরণ করতে, ওপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে, অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দিতে এবং এককে অন্যের ওপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাতে। দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি, যাতে তারা বুঝে নেয়।

-সূরা আনআম-৬৫

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ও বান্দার অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তিনি আমাদের চতুর্দিক থেকে আযাব দিতে সক্ষম। আমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়ে দিয়ে আমাদেরকে অন্যান্য জাতির ন্যায় সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারেন। যার উদাহরণ কুরআনে বিদ্যমান।

মোট কথা এই আয়াতে তিন ধরনের শাস্তির কথা আলোচনা কর হয়েছে। (১) আসমানি শাস্তি (২) জমিনি শাস্তি (৩) পরস্পর ঝগড়া- বিবাদ। কিন্তু প্রথম দুই ধরনের শাস্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর বরকতে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। বাকি একটি শাস্তি রয়ে গেছে। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে।

سالت ربي ثلاثا فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدا، سألت ربي ان لا يهلك امتي بالسنة فأعطانيها وسألت ان لا يهلك أمتي بالغرق، فأعطانيها و سألت ان لا يجعل بأسهم
بينهم فمنعنيها.

আমি আল্লাহর কাছে তিনটি দু'আ করেছি। দুটি কবুল হয়েছে এবং একটি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন। আমার এই দু'আটি কবুল হয়েছে। এর পর দু'আ করলাম আমার উম্মতকে যেন ঝড়ে তুফানে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন। আমার এই দু'আও কবুল করলেন। দু'আ করলাম আল্লাহ যেন আমার উম্মতকে পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত না করেন। আমার এই দু'আটি ফিরিয়ে দেয়া হলো।

(مسند أحمد: 1516)

উল্লেখিত হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম, শেষ প্রকারের শাস্তি এই উম্মতের মধ্যে থেকে যাবে। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে বিরোধ, এখতেলাফ এবং মতানৈক্য, বিভক্তি ইত্যাদি।

আপনি যদি ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করে থাকেন। তাহলে দেখবেন, মুসলমানদের ওপর তাতারীদের নির্যতনের উত্থান পতনের যে কারণ ছিল তা হলো, সে সময় মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব এবং নিজেদের মধ্যে কঠিন এখতেলাফ যা ছিল শাস্তির চুড়ান্ত অবস্থা। ফলে ওখানকার এক গ্রুপ খ্রিস্টানদের সাথে মিলে তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করে দেয়। পরবর্তীতে যারা খ্রিস্টানদের সঙ্গ দিয়ে ছিল তাদেরকেও শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিতে স্পেন থেকে মুসলমানদের পতন ঘটে।
আমরাও যদি নিজেদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া করি, দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকি আর আমাদের দায়িত্ব আদায় না করি তাহলে আমরাও সেই শাস্তির স্বীকার হবো।

একবার রাসুলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- والذي نفسي بيده لتأمرن
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم
شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم

ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার জান, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং অবশ্যই অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে, যদি এমন না করতে থাক, তাহলে তোমাদের ওপর জালিম শাসক চাপিয়ে দেয়া হবে। তখন তোমাদের মধ্যে ভাল লোকেরা দু'আ করবেন কিন্তু তা কবুল করা হবে না।
(মুসনাদে আহমাদ-২৩৩২৭)

একটু ভাবলেই দেখতে পারব, আজ আমাদের ওপর কোন ধরনের ব্যক্তির শাসন চলছে। আল্লাহ তা'আলা খারাপ লোকদেরকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেন নি? এটা আল্লাহ তা'আলার অটল ও অনড় বিধান যে, যদি আমরা আমাদের দায়িত্বের অবহেলা করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিধান আমাদের ওপর প্রয়োগ করবেন।

আমরা দাওয়াতের অনিবার্য দায়িত্বটি ছেড়ে দিয়েছি। ফলে দুনিয়ার সবচাইতে খারাপ জাতিকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ভারতে ১৯৯২ সনে ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ শাহাদাতের এবং ২০০২ সালে গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা হয়তো আপনাদের স্মরণ আছে। ঐ সময় বিশ্বের সকল মুসলমানের মাঝে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ওই সময় এমন কোন ব্যক্তি ছিল, যিনি দু'আ করতে গিয়ে চোখের অশ্রু ঝরায়নি? দুনিয়ার এমন কোন্ স্থান ছিল, যেখানে দু'আ না করা হয়েছে।

হেরেমে মক্কা ও হেরেমে মদিনায় দু'আ করা হয়েছিল। পবিত্র রমযান মাসে স্থানে স্থানে দু'আ করা হয়েছে কুনুতে নাযেলা পড়া হয়েছে। কিন্তু কোন দু'আ আল্লাহর রহমত ও দয়াকে মুতাওয়াজ্জুহ করতে সম্ভবত এর কারণ এটাই ছিল যে, আমাদের অপরাধের কারণে আল্লাহর অটল বিধান ও নিয়মের বাস্তবাতা দেখিয়েছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- مرو بالمعروف وانهو عن المنكر قبل أن تدعوا ثم لا يستجاب لكم

তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান কর। ওই সময়ের পূর্বে যখন তোমরা দু'আ করবে কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য হবে না।"

(طبراني ده)

কুরআনে হাকীমে এই জন্যই বনী ইসরাইলের ওপর লানত করা হয়েছে। কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُون َ

বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত।

(সুরা মায়েদা ৭৮)

অন্য হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عن جرير بن عبد الله قال ما من رجل يكون فى قوم يعمل بينهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه فلا يغير والاصابهم الله بعذاب من قبل ان يموتوا . (سننا بوداود(

যারির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: কোনো ব্যক্তি যখন তার স্বজাতির মধ্যে গোনাহর কাজে লিপ্ত থাকে, আর ওই জাতি তাকে গুনাহর কাজ থেকে ফিরাতে সক্ষম, কিন্তু তারা তাকে ফিরালো না, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যুর পূর্বে আজাব দ্বারা গ্রেপ্তার করবেন।

(সুনানে আবু দাউদ)

আমরা যদি এ কাজ না করি তাহলে আল্লাহ তা'আলা অন্য জাতি নিয়ে। আসবেন।

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ۡ
যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।
(মুহাম্মদ: আয়াত: ৩৮)

এই আয়াত আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, আমরা আল্লাহর দাসত্ব করি বা না করি, তাতে আল্লাহর কিছুই আসে যায় না। কারণ তিনি আমাদের মোটেও মুখাপেক্ষি না। আর আমরা যদি তার হুকুম মেনে না চলি, তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করে এমন এক জাতি পাঠাবেন যারা আমাদের মত হবে না। আমাদের চেয়ে ভালো হবে। তারা শিরিক করবে না এবং আল্লাহকে মানবে। এ ধরনের অনেক ঘটনা ঘটিয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, সে সব ঘটনা থেকে একটি (ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করা হলো)।

শাস্তি থেকে বাঁচার উপায়:

এখন আমাদের ভাবার বিষয় হলো এই শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় কি? কি আমল করলে আমরা এই আজাব থেকে বাঁচতে পারবো, এর সমাধান আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার কালামে পাকে দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُون َ
অর্থ: তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা দুই একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না।
(সুরা তওবা-১২৬)

উক্ত আয়াতে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার জন্য পথ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তার আযাব থেকে বাঁচর উপায়ই দুটি: (ক) তাওবা করা (খ) উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ করা। নিচের আয়াতটিও তার বর্ণনা দিচ্ছে।

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।

(সেজদা: আয়াত: ২১)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

অর্থ: তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করেদেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।

(বাকারা: আয়াত: ১৬০)

উপরোক্ত আয়াত দুটিতে বনী ইসরাইলের ওপর এই জন্য লানত দেয়া হয়েছে, তারা আল্লাহর আহকামকে গোপন করেছে এবং আমল বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার ছেড়ে দিয়েছিল। আজ আমাদের অবস্থাও তাই। কুরআনকে শুধু ঘরের অলংকার-শোকেসের সৌন্দর্য বানিয়ে রেখেছি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাকে গোপন করছি। এমন কতো অমুসলিম আছে যাদের সাথে প্রতিদিন এক সাথে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য মোটকথা সব কিছুই হয়। কিন্তু হয় না শুধু দাওয়াতের ব্যবসা-বণিজ্য।

এখনোও যদি আমরা আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচতে চাই, তাহলে আমাদেরকেও ওই পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। যা ইউনুস (আ.) এর কাওম গ্রহণ করেছিল। তারাতো

ওই জাতিই যারা নিজ নবীকে মানতে অস্বীকার করে ছিল। তবে আল্লাহর শাস্তি আসতে দেখে তাওবা করল এবং তাদের নবীর ওপর ঈমান আনলো, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং শাস্তিকে ফিরিয়ে নিলেন। বললেন..

فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آَمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ
الخراي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ

অর্থ: সুতরাং কোন জনপদ কেন এমন হলো না যা ঈমান এনেছে অতঃপর তার সে ঈমান গ্রহণ হয়েছে কল্যাণকর? অবশ্য ইউনুসের সম্প্রদায়ের কথা ভিন্ন। তারা যখন ঈমান আনে, তখন আমি তুলে নেই তাদের ওপর থেকে অপমানজনক আযাব- পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌছাই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।(ইউনুস-৯৮)

কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাইলের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ করেছিলেন। ওই সম্প্রদায়ের মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। (১) শিকার কারী (জালিম) (২) মুত্তাকী অর্থাৎ যারা বিরত ছিল। (৩) বাধা প্রদানকারী। আল্লাহ তা'আলা শিকারকারী (জালিম) এবং মুত্তাকী অর্থাৎ যারা বিরত ছিল তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, বরং তাদের আকৃতিকে বিকৃত করে দিয়েছেন এবং বাধা প্রদানকারীদের পরিত্রাণ দিয়েছেন।
(এই ঘটনাটি সুরা আরাফের (১৬৩-১৬৬) আয়াতে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে।)

একই অর্থে একটি হাদিস আছে যা বুখারী তিরমিজীতে বর্ণিত হয়েছে। যার সারসংক্ষেপ হলো এই, তিন তলা বিশিষ্ট এক জাহাজে মানুষ আরোহন করেছে। পানির ব্যবস্থা ছিল তৃতীয় তলায়। নিচের তলার লোকেরা পানি আনার জন্য উপরে যেত, আর সেখানকার লোকদের কষ্ট হতো এ কথা চিন্তা করে তারা এ সিদ্ধান্ত নিল যে, আমরা যদি আমাদের তলার নিচ থেকে একটি ছিদ্র করে দিই, তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে এবং ওপর ওয়ালাদেরও কষ্ট হবে না। এবার যদি ওপর ওয়ালারা এ কথা বলে বসে যে, তারা

তাদের তলা ছিদ্র করবে তাতে আমাদের কি যায় আর আসে? তাহলে সকলেই ডুবে মরবে। এই মুসিবত থেকে বাঁচতে হলে নিচের তলার লোকদেরকে বাধা দিতে হবে।

আজ আমাদের অবস্থাও এর থেকে ভিন্ন নয়। আমরা শিরক করতে দেখেও মুখ খুলি না, কিছু বলি না। এমন অবস্থায় আমাদের ওপরও কি আল্লাহর শাস্তি আসতে পারে না? এই জাতিকে খুবই সুক্ষ্ম ভাবে ভাবা উচিত।

মোটকথা কুরআনে হাকীম এই শাস্তি থেকে বাঁচার একটিই উপায় বর্ণনা করেছে।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝
অর্থাৎ লানত ও শাস্তি হতে ওই লোকেরাই বাঁচবে যারা তিনটি কাজ আঞ্জাম দেবে। (১) তওবা করবে (২) এসলাহ করবে। (৩) যেই সমস্ত আহকাম গোপন করেছে তা মানুষের মাঝে বর্ণনা করবে।
(বাকারা-১৬০)

স্পষ্ট থাকে যে, প্রথমে তওবা ওই অপরাধের কারণে বলা হয়েছে, যা উপরে আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সত্যকে গোপন করা। উদ্দেশ্য হলো যে, সামনে থেকে আমাদের ইলমকে গোপন করবোনা এবং অন্যকে হক কথা বলবো। দ্বিতীয় নাম্বারে নিজের এবং অন্যের এসলাহ করবো এবং আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করেন। আমিন!

আদ্ধাতিক শক্তি:

দাওয়াতী কাজ করার জন্য সবচেয়ে বেশী যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হলো আদ্ধতিক শক্তি। আল্লাহর সাথে গভীর সুসম্পর্ক তৈরী করা। নিজেকে পাপ মুক্ত করা। বেশী

বেশী কুরআনে পাকের তেলাওয়াত করা। জিকির করা। নফল নামাজের পাবন্দি হওয়া। আল্লাহ ওয়ালাদের সহবতে বেশী বেশী সময় কাটানো। এসব কাজ করলে আদ্ধাতিক শক্তি তৈরী হবে। যুগে যুগে যারাই দাওয়াতী কাজ করেছে আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল খুবই সুগভির। আদ্ধাতিক সম্পর্ক ছিল খুবই মজবুত।

দুয়া:

আমাদের আরেকটি করনীয় বিষয় হলো, দরদের সাথে তাদের জন্য দুআ করা। অমুসলিমদের নাম ধরে দুআ করা নবীজীর সুন্নাত। আমাদেরও উচিৎ খ্রিস্টান মিশনারী ধর্মান্তরের শিকার হয়ে অনেক সাধারণ মুসলমান চিরদিনের জন্য সরল পথ হারিয়ে জন্য জাহান্নামী হচ্ছে। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচার করে, মুসলিম মন-মস্তিষ্ককে খ্রিস্টবাদের সাথে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এমতবস্থায় প্রিয় ছাত্র ভাইদের কর্তব্য মিশনারীগুলোর তৎপরতার অবগতি ও তা দূর করার পন্থা চর্চার মাধ্যমে তাদের খ্রিস্ট রাজ্য করার স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিনত করা এবং তাদের অপতৎপরতা গতিকে রুখে দেয়া। এই ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কয়েকটি কাজ করা যেতে পারে।

শিক্ষা:

আমাদের উচিৎ, আমরা শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে এই ধর্মান্তরিতের অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করা। এর জন্য আমাদেরই উচিৎ আমরা গ্রামে গ্রামে মক্তব প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী স্কুল তৈরী করা। আমাদের অধিনে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা। সেই ছাত্রদেকে দ্বিনদার বানানোর ফিকির করা।

সেবা:

আজ খ্রিস্টানরা সেবার আড়ালে ধর্মান্তরের কাজ করছে। খ্রিস্টান বানাচ্ছে। তাই আমাদের সেবার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ করা উচিৎ। শুধু সেবা করলেই হবেনা। দাওয়াতও দিতে হবে। আল্লাহ আমাদের সেবার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ করার তৌফিক দান করুন। প্রতিটি মাদরাসা একটি এনজিও। তাই মাদরাসার একটি ফান্ড থাকার দরকার। যার দ্বারা সাধারণ মানুষের সেবা করা যাবে।

অন্যকে ধর্মীয় কাজে জোড়ানো:

সেবার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম মুখী করা। একই জাল দিয়ে সব মাছ ধরা যায় না। তাই বিভিন্ন মাছের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জালের প্রয়োজন হয়। তাই মানুষকে ইসলামমুখী করার কার জন্য যার যেদিকে মন যায়, সে দিকে লাগিয়ে দেওয়া। যেমন কেউ তাবলিগ পছন্দদকরে না, তবে পীর মুরিদী পছন্দ করে, তাকে হক্কানী পীরের সন্ধান দিয়ে দেওয়া। যে কোনো ভালো কাজের সাথে জুড়িয়ে দেওয়া।

চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত:

আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম অমুসলিম নেতাদের চিঠি-পত্রের মাধ্যমে দাওয়াত দিতেন। আপনিও সে সুন্নাত আদায়ের লক্ষ্যে দেশের অমুসলিম এমপি মন্ত্রিদের কাছে দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিন। আপনার চিঠি পাওয়া তাদের হক।

খৃষ্টান মিশনারির ধর্মান্তরের শিকার হয়ে অনেক সাধারণ মুসলমান চিরদিনের জন্য সরলপথ হারিয়ে জাহান্নামী হচ্ছে। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের

নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার করে মুসলিম মনন-মস্তিস্ককে খৃষ্টবাদের ছাঁচে নেওয়ার কৌশল করছে। এমতাবস্থায় প্রিয় ছাত্রভাইদের কর্তব্য, মিশনারিগুলোর তৎপরতার অবগতি ও তা দূর করার পন্থা চর্চার মাধ্যমে তাদের খৃষ্টরাজ্য গড়ার স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করা এবং তাদের অপতৎপরতার গতিকে রুখে দেওয়া। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কয়েকটি কাজ করা যেতে পারে –

ইসলামের সপক্ষে একাধিক মিডিয়া দরকার:

বাংলাদেশে যখনই ইসলামের ওপর আন্তর্জাতিক বা স্থানীয় কোনো বিপদ বা আগ্রাসন এসেছে, তখনই নতুন করে ইসলামপন্থীদের নিজস্ব মিডিয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করেন সবাই। সবগুলো মিডিয়া যখন একযোগে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানায়, নির্লজ্জ হলুদ সাংবাদিকতার মাধ্যমে ইসলামের স্বপক্ষের লোকদের খলনায়ক আর প্রকৃত খলনায়কদের নায়ক বানায়, তখনই সবাই নিজেদের মিডিয়ার শূন্যতা বোধ করেন। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে না হতেই এই বাস্তবতা ও অভাবের কথা ভুলে যান। দিনদিন যেখানে আধুনিক মিডিয়ার শাখা-প্রশাখা ডালপালা মেলছে, সেখানে বাংলাদেশে প্রকৃত ইসলামপ্রেমী একটি জাতীয় দৈনিকও নেই।এই নাস্তিক ও তাদের দোসরদের মোকাবেলায় এখনই অনতিবিলম্বে দরকার একাধিক জাতীয় দৈনিক এবং একাধিক মিডিয়া।

মিডিয়ার মাধ্যমে সত্যকে সত্য হিসেবে মানুষের সামনে তুলে ধরা, যাতে তারা মিডিয়ায় অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামের ক্ষতি সাধনে ব্যর্থ হয়।

রাজনীতিবিদদের সতর্ক করাঃ

খৃষ্টান মিশনারিগুলো এ দেশের রাজনৈতিক ফিল্ড নিজেদের দখলে আনার জন্য রাজনীতিবিদদের মগজ ধোলাই কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।লামের ক্ষতি সাধনে ব্যর্থ হয়।

এর উৎকৃষ্ট নজির জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও ফতোয়া বিরোধী রায় বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা। তাদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে আমাদের উচিত রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সরকারী বেসরকারি সিনিয়র কর্মকর্তা ও সব শ্রেণীর লোকদের উক্ত বিষয়ে সরাসরি ও চিঠির মাধ্যমে সতর্ক করা।

লেখালেখিঃ

আজ লেখালেখি ও প্রকাশনার দিক দিয়েও তারা পিছিয়ে নেই বরং একধাপ এগিয়েই আছে। খৃষ্টান মিশনারিগুলো মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বই লিখে প্রচার করছে। তার মধ্যে কয়েকটি বইয়ের নাম আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি – "গুনাহগারদের জন্য বেহেশতের পথ" (এই নামটির শুরুতে আরবিতে লেখা – "ত্বারিকুল জান্নাতি লিল মুযনিবি"), বেলালের লেখা "আপনার জন্য আমার অন্তরের কথা", "গুনাহ থেকে মুক্তির পথ", "কুরআনের আলোকে জান্নাতের পথ" ইত্যাদি। এগুলো হলো মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে লেখা খৃষ্টানদের বই। কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয়, খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে কিংবা হিন্দুদের উদ্দেশ্যে লেখা কয়টি বই আছে আমাদের ?

আমার ভাই, আমাকে একটি বই দেখান যে, এই বইটি খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে লিখে তাদের মাঝে প্রচার করা হচ্ছে।

উলামায়ে কেরামের করণীয়

উলামায়ে কেরাম হলেন ধর্মীয় অভিভাবক। আর ধর্মীয় অভিভাবকদের দায়িত্ব তো আরো বেশী। ছকে বাঁধা দ্বীনি খেদমতে আবদ্ধ হয়ে থাকা তাদের শান নয়। সমাজের গভীরে অনুপ্রবেশকারী মিশনারি ও তাদের তাবেদার এনজিওদের অপতৎপরতার প্রতি সুতীক্ষ্ণ নজর রাখা তো তাদের ফরয কর্তব্য।

কতো ভালো হতো, যদি উলামায়ে কেরাম নিম্ন বর্ণিত বিষয়ের প্রতিও মনোযোগী হতেন –

(১) সরাসরি খৃষ্টানদের দাওয়াত দেওয়া, বিশেষ করে যারা খৃষ্টধর্মের প্রচারক।

(২) ব্র্যাক, আশা ইত্যাদি স্কুলের মোকাবেলায় মসজিদে মসজিদে মক্তব প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিটি গ্রামে একটি করে ইসলামিক কিন্ডারগার্ডেন স্কুল কায়েম করা।

(৩) ব্র্যাক স্কুল, আনন্দ স্কুল ইত্যাদি স্কুলে মুসলমান বাচ্চাদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার জন্য ধর্মীয় শিক্ষকের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা।

(৪) অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা।

ব্যবসায়ী ও বিত্তবানদের করণীয়

আল্লাহ আপনাদের অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ'র রাস্তায় খরচ করার জন্য। আজ খৃষ্টানরা যদি তাদের আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ তাদের মিথ্যা ধর্ম প্রচারের জন্য খরচ করতে পারে, তাহলে আমরা কেন আমাদের সত্য ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে খরচ করতে পারবো না। আমাদের তো বরং দ্বীন প্রচারের জন্য প্রয়োজনে সমস্ত সম্পদ ব্যয় করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে।

সর্বসাধারণের জন্য করনীয়

ডাঃ জাকির নায়েক স্যার কোন এক লেকাচারে বলছিলেন,

আপনি যদি মনে করেন আমি শাইখ আহমেদ দিদাত এর মতো হবো তারপরে দাওয়াতী কাজ শুরু করবো। তাহলে আপনার এই চিন্তা ভুল। হতে পারে আপনি কখনও আহমেদ দিদাত এর মতো হতে পারবেন না ।

এজন্য যতটুকু জানেন ততটুকু নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। অন্যন্যাদের কে আহবান করুন যাতে তারাও এ কাজে অগ্রসর হয় । ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে প্রতিরোধের দূর্গ গড়ে তুলে যাতে আমরা সফলকাম হতে পারি। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১-বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা ও আমাদের করনীয়। মুফতি যুবায়ের আহমেদ।

২-মুসলিম বিশ্বে ইহুদী খ্রিষ্টানদের মরণ ছোবল।মুফতি মীযানুর রহমান কাসেমী।

৩-হিন্দুভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি।মুফতি যুবায়ের আহমেদ।

সোর্সসমূহ:

১-http://www.hadithbd.com/books/link/?id=9699

২-উইকিপিডিয়া।

৩-http://www.hadithbd.com/books/link/?id=10657

৪-http://www.hadithbd.com/books/link/?id=10640